জিয়ন নদী

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্যম্ । ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশক : ১৯৫৭

প্রকাশক :
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম চরণ

জীবন প্রত্যহ
সকাল বিকেলের যে চেনা গদ্যে...

কবি বিনয় মজুমদার

এ আমাদের অফিসপাড়া, ডালহাউসি স্কোয়্যার। সরকারি নাম বিবাদি বাগ। অন্যদিনের মতো ডালহাউসি আজও রাজ্যের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রাজধানী। তারই মাঝখানটিতে হেঁটে চলেছে রাধা রায়, দু'চোখে স্বপ্ন-আঁকা তরুণী। অন্যদিনের মতো ডালহাউসি আজও সরগরম। সামনের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে হাতের চিরকুটটায় একঝলক চোখ বুলিয়ে নিল রাধা। মনে হয় এই সেই ঠিকানা। ওই বাড়িটাই হবে। রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। অফিসপাড়ার আর পাঁচটা বাড়ির মতোই এখানেও তাই অনেক ব্যবসায়িক সংস্থার অফিস। তেমনই একটি ফার্মের অফিসে যাচ্ছে রাধা। বাড়ির মূল গেট পেরিয়ে একতলার বারান্দায় পৌঁছে সামনের দেওয়ালে ঝোলানো সারি সারি লেটারবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে হাতের চিরকুটে চোখ রাখল, স্মিথ সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ফার্স্ট ফ্লোর! সিঁড়ির দিকে এগোল রাধা।

এই ফার্মের সিনিয়র পার্টনার গগন সান্যাল এবং রাধার বাবা সন্দীপ রায় কর্মসূত্রে পরিচিত। সন্দীপ যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী,

স্মিথ সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি সেই ব্যাঙ্কের স্ট্যাটুটরি অডিটর। মেয়ে বি কম পড়ার পাশাপাশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়া শুরু করতে চায় জেনে সন্দীপ গগনকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর ফার্মে রাধাকে তিনি আর্টিকল্ড ক্লার্ক হিসেবে নিতে পারেন কি না। গগন রাজি হয়েছিলেন, বলেছিলেন, রাধা যেন অফিসে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। আজ সেই দেখা করার দিন। সন্দীপ মেয়ের সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। রাধা বারণ করেছিল, "বাবা, কতদিন তুমি আর মা আমাকে প্রোটেকশন দিয়ে বেড়াবে?"

সন্দীপ জবাব দেওয়ার আগেই অপালা বলে উঠেছিলেন, "কেন. তোর বাবা খারাপটা কী বলেছেন? অফিস-কাছারির কোনও অভিজ্ঞতা আছে তোর? এই প্রথম একটা অচেনা অফিসে যাবি, বাবা সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এতে দোষটা কোথায় হল?"

মায়ের কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে রাধা গম্ভীর মুখে বলেছিল, "জীবনে আমাকে অনেক কিছুই নিজের চেষ্টায় শিখতে হবে, অফিস-কাছারির চালচলনও। শিখতে যখন হবেই, তখন আর দেরি করতে চাই না।"

মেয়ের জেদ দেখে অপালা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন স্বামীর দিকে। সন্দীপের মুখের ভাব চিন্তিত দেখালেও মেয়ের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেষ্টা তাঁকে খুশি করেছিল। তিনি একটু ইতস্তত করে বলেছিলেন, "একে প্রথম দিন, তার উপর চার্টার্ড ইনস্টিটিউট আর ফার্মের মধ্যে তোর আর্টিকল্‌শিপের ফর্মালিটিজ়গুলো এখনও কমপ্লিট হয়নি। একাই যাবি? ঠিক আছে, আমি মি. সান্যালের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেব।"

রাধা খুশি হয়ে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হতে ঘরে চলে গেল। অপালা বলেছিলেন, "ওইটুকু মেয়ে কী বলল, আর তুমিও মেনে নিলে? ওর সঙ্গে যাওয়া তোমার উচিত ছিল!"

স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে সন্দীপ নরম গলায় বুঝিয়েছিলেন, "ভেবো

না, ও ঠিক সামলে নেবে। রাধা বড় হচ্ছে। আমরাও তো চাই, ও বড় হোক।"

দোতলায় পৌঁছে রাধা সামান্য দিশেহারা বোধ করল। অজস্র দরদালান চারদিকে। কোনটা দিয়ে গেলে স্মিথ সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে পৌঁছোনো যাবে বুঝতে পারল না সে। কাছাকাছি লোকজনও কেউ নেই যে জিজ্ঞেস করা যাবে। অফিসটাইম এখনও শুরু হয়নি। আগেই এসে পড়েছে সে। বিশাল বাড়ির ভিতরের জনশূন্য গলিঘুঁজির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু গা ছমছমে অনুভূতি হল। বাবা বলেছিলেন, গগন সান্যাল ফার্স্ট আওয়ারেই যেতে বলেছেন। সেই নির্দেশ মাথায় রেখে সাততাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। ফার্স্ট আওয়ারের বেশ খানিকটা আগেই পৌঁছে গিয়েছে। এখন কী করা যায়? বাবাকে আনলেই কি ভাল হত? রাধা ডাকাবুকো মেয়ে নয়। সে এটা জানে বলেই ভিতরের ভয়, সংকোচ, আড়ষ্টতা এসব হাজারও দুর্বলতা জয় করতে চায়। তাই আজ এখানে একা আসতে চেয়ে জেদ ধরেছিল। মনে জোর এনে রাধা ভাবল, সামনের ওই করিডরটায় ঢুকে পড়ি! তারপর যা থাকে কপালে। কিছুক্ষণ পরে অফিসে লোকজন এসে যাবে। ততক্ষণে যদি খুঁজে না-ও পাই, তো কাউকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে। একটা গলি লক্ষ করে হনহনিয়ে সেদিকে এগোতে যাচ্ছিল রাধা। তখনই দেখল, হাতে ব্রিফকেস, ছিমছাম চেহারার বছর বাইশ-তেইশের এক সুবেশ তরুণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের করিডরে ঢুকছে। রাধা দ্রুতপায়ে তাকে অনুসরণ করে পিছন থেকে ডাক দিল, "এক্সকিউজ মি!"

তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল। রাধা কাছে গিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখানকার কোনও অফিসের কর্মী?"

তরুণও ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "কেন বলুন তো?"

তার কথায় অসন্তোষের আভাস। রাধা অপ্রস্তুত বোধ করল। তবু সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করে বলল, "আমি এখানে একটা অফিসের খোঁজ করছি। অফিসটা এই বিল্ডিং-এর ঠিক কোথায় বুঝে উঠতে পারছি না। এত করিডর চারপাশে..."

তরুণের মুখের ভাব মুহূর্তে বদলে গেল। সে হেসে বলল, "ওঃ! হ্যাঁ, এই সমস্যাটা এখানে প্রথমবার এলে সকলেরই হয়। আমিও সব অফিস চিনি না। তবে আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি। আপনি কোন অফিসে যাবেন?"

"স্মিথ সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস।"

অফিসের নামটা শুনে রীতিমতো কৌতুক বোধ করল তরুণ। বলল, "ও, আপনি ওই অফিসে যাবেন?"

রাধার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি অফিসটা চেনেন?"

তরুণ মাথা নাড়ল, "আসুন আমার সঙ্গে।"

করিডর দিয়ে কিছুটা গিয়েই অফিসটা দেখতে পেল রাধা। ঘষাকাচ বসানো দরজার উপরে লেখা আছে 'স্মিথ সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস'। রাধা দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল তরুণের দিকে, "থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আপনি হেল্‌প না করলে অফিসটা খুঁজে পেতে বেশ অসুবিধে হত। আমি তো অন্যদিকের করিডরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। থ্যাঙ্কস।"

"ওয়েলকাম। এমন হয়। চলুন, ভিতরে ঢোকা যাক।"

রাধা অবাক হয়ে গেল। বলল, "আপনিও কি...?"

"হ্যাঁ, আমিও এই অফিসেই কাজ করি। আসুন।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে রাধা জিজ্ঞেস করল, "আপনিও কি এখানে আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক?"

"না, আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক নই," মৃদুস্বরে জবাব দিল তরুণটি।

বিশদে কিছু জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা হয়ে যাবে কি না ভাবতে-

ভাবতে অফিসের ভিতর ঢুকে রাধা দেখল, একজন উর্দিপরা বয়স্ক পিয়ন টেবিল-চেয়ার সাফ করছিল। রাধার সঙ্গের তরুণকে দেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল। তরুণ রাধার দিকে ঘুরে বলল, "কার সঙ্গে দেখা করবেন?"

"মি. জি বি সান্যাল।"

"গগনবিহারী সান্যাল? এখনও এসে পৌঁছোননি। মিনিট কুড়ির মধ্যে চলে আসবেন," সোফাটা দেখিয়ে তরুণ বলল, "আপনি বরং এখানে বসে অপেক্ষা করুন!" পিয়নকে ডেকে বাংলায় নির্দেশ দিল, "হরিলাল, বড়া সাব এলে এঁকে ওঁর কাছে নিয়ে যাবে।"

রাধাকে একটুকরো সৌজন্যভরা হাসি উপহার দিয়ে তরুণ লম্বা পা ফেলে অফিসের অন্য প্রান্তে চলে গেল।

রাধা সোফায় বসে চারপাশে তাকাল। সে যেখানে বসে আছে সেটা সম্ভবত, এখানে বিভিন্ন কাজে যারা আসে তাদের বসে অপেক্ষা করারই জায়গা। ঘরের দু'প্রান্তে কয়েকটা দরজা দেখে মনে হয়, ওদিকে আরও গোটাকয়েক ছোট ঘর আছে। যে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এল, সেই তরুণকে আর দেখতে পাচ্ছে না রাধা। ও বোধহয় ওই ঘরগুলোর কোনওটায় ঢুকেছে। ছেলেটা ঠিক কী কাজ করে এখানে? ওর নামটা পর্যন্ত জানা হল না। নিজে থেকে তো জিজ্ঞেস করা যায় না। ও-ও তো রাধার নাম জানতে চায়নি। একা বসে থাকতে-থাকতে সামান্য টেনশন হতে করতে শুরু করল রাধার। এই গগনবিহারী সান্যাল ভদ্রলোক কেমন কে জানে! ভদ্রলোক কি খুব রাশভারী? কাজে ভুল হলে ভীষণ বকাবকি করেন? বাবাকে এসব জিজ্ঞেস করতে পারেনি রাধা, পাছে বাবা তার উৎকণ্ঠা টের পেয়ে যান। ভিতরের দুর্বলতা এখন কাউকেই বুঝতে দিতে চায় না রাধা, বাবাকেও না। এ তার নিজের লড়াই, নিজেকেই ঠেকে শিখতে হবে। অনেক উপরে উঠতে চায় রাধা, অনেক উচ্চাশা। দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সবল হয়ে উঠতে তাকে হবেই।

একে-একে আরও কয়েকজন এসে ঢুকল অফিসে। কয়েকজন রাধারই বয়সি তরুণ-তরুণী। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রাধাকে তারা একঝলক দেখে নিয়ে এক-একটা কিউবিকলে ঢুকে পড়ল। কোনও কিউবিকলে দু'জন, কোথাও তিন-চারজন, এরকম। দু'জন মাঝবয়সি ভদ্রলোকও এলেন। তাঁরা রাধাকে দেখলেন কি দেখলেন না, বোঝা গেল না। নিজের-নিজের টেবিল-চেয়ারে বসে ফাইলপত্র টেনে কাজ শুরু করলেন। রাধা একবার উঠে গিয়ে হরিলালকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, মি. জি বি সান্যাল অফিসে পৌঁছেছেন কি না। হরিলাল হাত নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করল, "আপনি বে-ফিকর বসিয়ে থাকেন। বড়া সাব এসে গেলেই আমি উনাকে আপনার এত্তেলা দিয়ে দিব," একচিলতে সাদা কাগজ রাধার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার নাম-ঠিকানা ইখানে লিখে দিন।"

রাধা তার নাম-ঠিকানা লিখে কাগজটা হরিলালকে ফেরত দিল। দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট, ব্রিফকেস হাতে উর্দিপরা একজন বাইরে থেকে অফিসের দরজা খুলে ধরে সেখানেই একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার পাশ দিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকে এলেন সুট-বুট-টাই পরা এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। পিছনে ব্রিফকেস হাতে লোকটিও এল। হরিলাল সেলাম ঠুকে দ্রুতপায়ে গিয়ে অফিসের একপ্রান্তে একটি ঘরের দরজা খুলে ধরল। ভদ্রলোক অফিসের কোনও দিকে না তাকিয়ে রাধার সামনে দিয়ে হেঁটে ঢুকলেন সেই ঘরে, পিছনে ব্রিফকেস হাতে লোকটি, সঙ্গে হরিলালও ঢুকল। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাধার বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনিই মি. জি বি সান্যাল। অফিসের আবহাওয়াটাই বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। রাধার বুক ধুকপুক করতে শুরু করল। অফিসে এসি চলছে পুরোদমে। তবুও সে ঘেমে উঠল। উরে বাবা! ইনি যে ভয়ানক জাঁদরেল ব্যক্তি। বাবার পরিচিত হলেও আদৌ বাবার মতো নন। বাবা সাধারণ ব্যাঙ্ককর্মী। মোটেও জাঁদরেল নন। আভিজাত্য এবং

ব্যক্তিত্ব এমন জানান দেয় না বাবার ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র উপস্থিতির জোরে চারপাশের জিনিসকে তিনি এভাবে বিবশ করে দিতে পারেন না। উর্দিপরা যে লোকটা ব্রিফকেস বয়ে এনেছিল, সে বড়সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে অফিসের বাইরে চলে গেল। লোকটা সম্ভবত সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার। কয়েক মুহূর্ত পরে হরিলালও বেরিয়ে এল সাহেবের ঘর থেকে। সে রাধার কাছে এসে বলল, "যাইয়ে, বড়াসাব আপনাকে ডেকেছেন। দরজা নক করে ঢুকে যান।"

রাধা কম্পিত পায়ে বড়সাহেবের চেম্বারের সামনে গিয়ে দরজায় আলতো টোকা দিয়ে দরজা সামান্য ফাঁক করে শুকিয়ে যাওয়া গলায় মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, "মে আই কাম ইন, স্যার?"

"ইয়েস, কাম ইন," ভারী গলায় আহ্বান এল।

রাধা ভিতরে ঢুকে যথাসম্ভব সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করতে-করতে ভদ্রলোককে অভিবাদন করল, "গুড মর্নিং, স্যার!"

গগন সান্যাল তাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গুড মর্নিং! বাট, ইউ লুক আ বিট টেন্‌স। ভয়ের কিছু নেই। এখানে আমরা কেউ মানুষখেকো বাঘ-ভল্লুক নই। রিল্যাক্স।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

"ইউ নিড টু গেট স্মার্টার। হয়ে যাবে। এখানে কাজ করতে-করতে ইউ উইল চেঞ্জ। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কোর্সে আর্টিক্‌লশিপের ব্যাপারটা ওই কারণেই রাখা হয়েছে। শুধুই হিসেবনিকেশ করলে তো চলবে না, কর্পোরেট কালচারটাও শিখতে হবে। কী তাই তো?"

রাধার জড়তা একটু-একটু করে কাটছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, "ইয়েস স্যার!"

"গুড। তোমার বাবা আমাকে ফোন করেছিলেন। তুমি ওঁকে সঙ্গে আনতে চাওনি। আই লাইক ইয়োর স্পিরিট!"

রাধা মাথা নামিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!"

"ঠিক আছে, তুমি অশ্রুর সঙ্গে দেখা করো। ও তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।"

রাধা একটু অবাক হল। সেটা খেয়াল করলেন গগন সান্যাল। তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "অশ্রুজিৎ সান্যাল, ফার্মের জুনিয়র পার্টনার অ্যান্ড মাই সান। বাইরে হরিলালকে বলো, ও তোমাকে অশ্রুর ঘর দেখিয়ে দেবে।"

রাধা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গগন সান্যাল টেলিফোনটা কাছে টেনে নিয়ে ইন্টারকমে কল করলেন। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বললেন, "অশ্রু, আমি একটি মেয়েকে তোর কাছে পাঠাচ্ছি, নাম..."

হরিলাল ফার্মের জুনিয়র পার্টনার অশ্রুজিৎ সান্যালের চেম্বার দেখিয়ে দিল। রাধা ওড়নায় মুখ মুছে সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে আসার অনুমতি চাইল, "মে আই কাম ইন, স্যার?"

"ইয়েস প্লিজ।"

রাধা ভিতরে ঢুকে সামনে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজারই কাছে। আরে! এ তো সেই ছেলেটি, যে তাকে এই অফিসটা চিনিয়ে দিয়েছিল। এ-ই অশ্রুজিৎ সান্যাল, ফার্মের একজন পার্টনার? ছি ছি, রাধা একেই কিনা জিজ্ঞেস করেছিল, সে এখানে আর্টিক্‌লড ক্লার্ক কি না। রাধার মুখ অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠল। অশ্রুজিৎ তার সমস্যাটা বুঝল হয়তো। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে আহ্বান করল, "মিস রাধা রায়, ওয়েলকাম টু স্মিথ সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি। দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?" টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে ভারী ভদ্র মৃদুস্বরে বলল, "বসুন।"

রাধা অস্ফুটে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে এসে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে

বসে পড়ল, কতকটা যেন পুতুলের মতো। অশ্রুজিৎ ফিরে গেল তার চেয়ারে। মুচকি হেসে বলল, "আমি তখনই আপনাকে নিজের পরিচয় দিতে পারতাম। কী, আমি তো জানতাম না আপনি কেন এখানে এসেছেন!"

রাধা প্রত্যুত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। অশ্রুজিৎ কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে নিয়ে বলল, "ফার্স্ট ইয়ার?"

রাধা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে 'তুমি' বলছি।"

রাধা নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'তুমি' বলারই তো কথা। অশ্রুজিৎ রাধার চেয়ে ক'বছরের বড় হবে? দেখে তো মনে হয়, খুব বেশি হলে চার কি পাঁচ। এমনিতে রাধারও তাকে 'তুমি' বলে ডাকাই স্বাভাবিক শোনাবে। কিন্তু, তা বোধহয় সম্ভব নয়, ফার্মের পার্টনার বলে কথা! রাধা সেখানে সামান্য আর্টিক্‌লড ক্লার্ক। অশ্রুজিৎও এ ব্যাপারে কিছু বলল না। বলল না যে, 'তুমিও আমাকে 'তুমি' বলে ডাকতে পারো।' বরং জিজ্ঞেস করল, "তুমি তোমার মার্কশিট, সার্টিফিকেট সব এনেছ?"

· "এনেছি," ব্যাগ খুলে কাগজপত্র এগিয়ে দিল রাধা।

"বাঃ! খুব ভাল রেজ়াল্ট তো!" সপ্রশংস কণ্ঠে বলল অশ্রুজিৎ, "ব্রিলিয়ান্ট!"

রাধা মৃদুস্বরে ধন্যবাদ জানাল। অশ্রুজিতের সাহায্যে আর্টিক্‌লশিপ সংক্রান্ত দরকারি ফর্ম ইত্যাদি পূরণ করতে বেশি সময় লাগল না। অশ্রুজিৎ বলল, "আমাদের তরফে কাগজপত্র সব আজই আমরা চার্টার্ড ইনস্টিটিউটে পাঠিয়ে দেব," এক মুহূর্ত থেমে রাধার দিকে তাকিয়ে হেসে হাত বাড়িয়ে বলল, "কনগ্র্যাট্‌স, তুমি এখন এই ফার্মের আর্টিক্‌লড ক্লার্ক।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ," অশ্রুজিতের বাড়িয়ে দেওয়া হাত আলগোছে ধরে মৃদুস্বরে বলল রাধা।

"তুমি চাইলে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারো। আর যদি মনে করো দু'-চার দিন পর থেকে, তো তাও..."

"আমি আজ থেকেই শুরু করতে চাই।"

"গ্রেট! চলো তোমাকে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই," চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল অশ্রুজিৎ। রাধাও উঠে দাঁড়াল। তাকে সঙ্গে করে ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে অশ্রুজিৎ বলল, "আমার বাবার নাম গগনবিহারী সান্যাল। কিন্তু বাবা বলেন, তিনি মাটিতে পা রেখে চলতে ভালবাসেন।"

পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে রাধার দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল, "আর্টিক্‌লড ক্লার্কের কাজ করতে গিয়ে এমন ভাবলে চলবে না যে, এই সামান্য কাজটা কেন আমি করব। সব কিছুতেই কিছু না-কিছু শেখার আছে। ধৈর্যের শিক্ষাও যত্ন করে আয়ত্ত করতে হয়।"

"আমি করব। সবই শিখতে চেষ্টা করব।" মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে জানাল রাধা।

"গুড।"

রাধাকে সঙ্গে করে অশ্রুজিৎ একটা কিউবিকলে ঢুকল। জনাচারেক তরুণ-তরুণী সেখানে বসে কাজ করছিল। একজন একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। অশ্রুজিৎ বসল না। রাধাকে বলল বসতে। বাকিদের উদ্দেশে বলল, "ওর নাম রাধা রায়। আমাদের নতুন আর্টিক্‌লড ক্লার্ক। তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে। শুরুতে ব্যাপারটা বুঝতে ওর হয়তো একটু সাহায্যের প্রয়োজন হবে। প্লিজ় হেল্‌প হার," বিশেষ করে একজনকে নির্দেশ দিল, "সায়ন, ওকে কোনও কাজ দে, শি ইজ় ইন ইট ফ্রম টুডে, ফ্রম রাইট নাও।"

"শিয়োর," সায়ন ঘাড় নাড়ল।

"লাকি ট্রেডিং কোম্পানির ট্রায়াল ব্যালান্সের কতদূর?"

"হয়ে এসেছে, অশ্রুদা। আজ কমপ্লিট করে ফেলব।"

"দুপুর দুটোর মধ্যে করে ফেলা চাই। চারটের সময় ওদের লোক আসবে, তার আগে আমি নিজে একবার চেক করে নিতে চাই।"

"হয়ে যাবে, দুটোর আগেই তোমার টেবিলে দিয়ে দেব।" সায়ন প্রত্যয়ী কণ্ঠে জবাব দিল।

"গুড!" অশ্রুজিৎ ঘুরে তাকাল রাধার দিকে, "গুড লাক।" জবাবে রাধা থ্যাঙ্কস বলতে গেল। তার আগেই অশ্রুজিৎ কিউবিকল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতেই সায়ন রাধার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, "গর্তে ওয়েলকাম।"

রাধা ভ্যাবলা বনে গিয়ে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল সায়নের দিকে। সায়ন বোধহয় বছর দু'-তিন বড় হবে রাধার চেয়ে। সে বাকিদের দিকে তাকিয়ে হতাশ মুখভঙ্গি করে বলে উঠল, "এ কোথাকার মেয়ে রে!" সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল। রাধা আরও বোকা বনে গিয়ে অস্বস্তিতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। সায়ন তার দিকে ঘুরে বলল, "কেন, শোনোনি সেই ছড়াটা? 'এসো এসো গর্তে এসো, বাস করে যাও দশটি দিন'।"

রাধা হেসে বলল, "শুনেছি।"

"তবে!" সায়ন গলার স্বর নামিয়ে বলল, "এও এক গর্ত, এই চার্টার্ডফার্মে আর্টিক্‌লগিরি করা। আমরা এখানে কাজ যত করি, অকাজ করি তার কয়েকগুণ বেশি। তুমিও তা-ই করবে," হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অশ্রুজিতের ভঙ্গি নকল করে বলে উঠল, "গুড লাক!"

সবাই আবার হেসে উঠল। রাধাও হাসতে-হাসতে বলল, "বেশ তো, আমাকে তা হলে একটা কাজ দাও।"

"কাজ করবে?" সায়ন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল।

রাধা মাথা ঝাঁকাল।

"খুব সিরিয়াস স্টুডেন্ট বুঝি? বয়স কত? কলেজে কোন ইয়ার?"

"আঠারো। ফার্স্ট ইয়ার।"

"হুম। আমার বয়স একুশ, বিকম থার্ড ইয়ার। এই কিউবিকলে আমিই বস। যা বলব সব অক্ষরে-অক্ষরে মানতে হবে কিন্তু!"

"মানব," বাধ্য মেয়ের ভঙ্গিতে জানাল রাধা।

"বেশ, তা হলে শুরু করো ভাউচিং।" সায়ন একটা জার্নাল, ফাইলভরতি ইনভয়েস এবং একখানা পেনসিল এগিয়ে দিল রাধার দিকে। বলল, "তুমি যত বড় হনুই হও, পড়াশুনোয় যত ভালই হও, এখন কিছুদিন শুধু ভাউচিং করে যাও। সব মহাজনই শুরু করেছে ওই থেকে।" গলা নামিয়ে বলল, "ওই অশ্রুজিৎ সান্যালও করেছে, আর তার বাঘা বাবাও করেছেন এককালে।"

রাধা হেসে বলল, "আর তুমি?"

"আমি!" সায়ন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি কোন খেতের মুলো যে ভাউচিং না করে পার পাব?"

রাধা হাসতে-হাসতে জার্নাল ফাইল ইত্যাদি কাছে টেনে নিয়ে কাজ শুরু করল। ভিতরে-ভিতরে বেশ হালকা বোধ করল সে। অফিস মানেই নাক-মুখ গুঁজে একটা ভয়ংকর কাজের জায়গা, এই ভুলটা ভাঙল। ভাবল, এখানে পরিবেশটা একেবারেই দমবন্ধ করা নয়। কাজ আছে, কাজের মাঝে হাসিঠাট্টাও আছে। দেখতে-দেখতে অফিসের সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। যে জনাদশেক আর্টিক্‌লড ক্লার্ক আছে এখানে, তাদের বয়স আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। বেশিরভাগই পরস্পরকে 'তুই-তোকারি' করে। বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে রাধাও সেই সম্পর্কের অংশীদার হল। ক্রমশ ফার্ম সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানতে পারল। গগন সান্যালই ফার্মের সর্বময় কর্তা। ওদিকে আর্টিক্‌লড ক্লার্কদের কর্তা হল অশ্রুজিৎ, তাদের যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ সে-ই দেয়। সায়নের সঙ্গে অশ্রুজিতের বয়সের তফাত বেশি নয় বলেই হয়তো সায়নকে সে 'তুই' ডাকে, সায়ন বলে 'অশ্রুদা, তুমি'। বাকি আর্টিক্‌লড ক্লার্কদের সে 'তুমি' বলে, তারা তাকে 'অশ্রুজিতদা,

আপনি'। আর ক'বছর পরে যেসব আর্টিক্‌লড ক্লার্ক ফার্মে আসবে তারা হয়তো অশ্রুজিৎকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করবে।

আরও একজন সান্যাল এই ফার্মে আছে, সে অশ্রুজিৎকে বলে 'দাদা, তুই'। গগন সান্যালের ছোট ছেলে অভিজিৎ প্রায় রাধারই বয়সি। রাধারই মতো সেও এই ফার্মে একজন আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক। বুদ্ধিতে কম না হলেও, স্বভাবে সে অশ্রুজিতের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রচণ্ড ফাঁকিবাজ। নানা ছুতোয় প্রায়ই অফিস থেকে কেটে পড়ে। প্রচুর বন্ধু, প্রচুর মেয়েবন্ধু। তারা অফিসে ওকে টেলিফোন করে। দু'-একজন তো অফিস থেকে প্রায় তুলে নিয়ে যায়। কখন কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি, বোঝা দায়। ডিস্কোথেক, নাইটক্লাব এসব জায়গায় হরদম আনাগোনা। প্রথম দিকে অভিজিৎ রাধার কাছে ঘেঁষতে চেয়েছিল। বিভিন্ন কায়দায় প্রেম নিবেদনের চেষ্টা করেছিল। রাধা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছিল। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল, সম্ভব নয়। অভিজিৎ আর জ্বালাতন করেনি। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে দুর্ব্যবহারও করেনি। অফিসে বন্ধুর মতো ব্যবহার করত। বোঝা যেত, এসবে তার কিছু যায়-আসে না। প্রেম করা, প্রেম ভাঙা, প্রেম-প্রস্তাবের কোনওটা গৃহীত হওয়া, কোনওটা ফেরত আসা, এগুলো তার কাছে জলভাতের মতোই স্বাভাবিক।

অফিসে বসে কাজ করার পাশাপাশি শহরে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের দফতরে গিয়ে অডিটের কাজও শুরু করল রাধা। এসব কাজে সাধারণত তিন-চারজন আর্টিকল্‌ড ক্লার্কের একটা দলকে পাঠানো হয়। ওই কয়েকজনের মধ্যে একজন থাকে টিমলিডার। সায়ন দলে থাকলে সে-ই টিমলিডার। নয়তো, আর কোনও সিনিয়র আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়ার নিয়ম অনুযায়ী আর্টিক্‌লশিপ তিন বছরের। ফলে ফার্মের আর্টিকল্‌ড ক্লার্কদের মধ্যে রাধার মতো এমন কিছু ছেলেমেয়ে

আছে, যারা সদ্য শুরু করেছে। আবার, এমনও কেউ-কেউ আছে, যাদের আর্টিকলশিপ শেষের দিকে। তাদেরই কেউ সাধারণত টিমলিডার হয়, তবে সেটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম নয়। দক্ষতা ও বুদ্ধির বিচারে কেউ অন্যদের চেয়ে এগিয়ে গেলে, তার বয়স ও অভিজ্ঞতা কম হলেও তাকে টিমলিডার বানাতে কোনও বাধা নেই। ফার্মে যোগদানে মাসকয়েক পর থেকে রাধাকেও অডিট টিমের লিডার করে পাঠানো শুরু হল। বাকি আর্টিকল্‌ড ক্লার্কদের কয়েকজন ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। তাদের মনে হয়েছিল, রাধাকে তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দেওয়া হল। দু'-একজন এমনও কানাকানি শুরু করল যে, রাধার প্রতি অশ্রুজিতের একটা দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। ভিতরে-ভিতরে দু'জনের বিশেষ একটা সম্পর্কের জন্যই রাধা এমন প্রশ্রয় পাচ্ছে। চার-পাঁচকান হয়ে রাধার কানেও এল এসব কথা। শুনতে খারাপ লাগলেও এসব কথাকে সে কোনও গুরুত্ব দিল না। সব বাজে কথা, সমস্ত ভিত্তিহীন গুজব। কাজের প্রয়োজনে অশ্রুজিতের সঙ্গে তাকে প্রায় প্রতিদিনই কথাবার্তা বলতে হয়। কখনও অশ্রুজিতের চেম্বারেও যেতে হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অশ্রুজিৎ নিজেই আসে তাদের কিউবিকলে। রাধা বোঝে, তার প্রতি অশ্রুজিতের আলাদা কোনও মনোভাব নেই। কোনও দুর্বলতাই নেই। তবে এটা ঠিক যে, অফিসের আর পাঁচটা মেয়ের মতো রাধাও ভিতরে-ভিতরে অশ্রুজিতের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করে। অশ্রুজিৎ রীতিমতো হ্যান্ডসাম, সপ্রতিভ তরুণ। বাজে কথা একদম বলে না। অথচ একেবারেই রূঢ়ভাষী নয়, হাবভাব বা কথাবার্তায় কোনও রুক্ষতা নেই। কখনও মনে হয় না সে কাউকে বা কারও মতামতকে অগ্রাহ্য করছে। ভর্ৎসনা করার প্রয়োজন হলে তাও করে দৃঢ় কিন্তু ভদ্র ভঙ্গিতে। মাত্র তেইশ বছর বয়সেই রীতিমতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বছর দুই আগে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পাশাপাশি সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি এবং কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ

পাশ করেছে। দুটোতেই র‍্যাঙ্ক-হোল্ডার। আসলে ছেলে হোক কি মেয়ে, ফার্মের সমস্ত চার্টার্ড-পড়ুয়া আর্টিকল্ড ক্লার্কদের চোখে অশ্রুজিৎ এক রোল-মডেল, তারা তাকে মনে-মনে পুজো করে। এরই পাশাপাশি ছেলেরা তাকে সামান্য হিংসেও করে। ওদিকে, রাধার বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রতি অশ্রুজিতের সহজ পেশাগত স্বীকৃতি মেয়েদেরকে রাধার প্রতি ঈর্ষাকাতর করে তুলেছে। ছেলেদেরকেও খানিকটা। একমাত্র ব্যতিক্রম অভিজিৎ। তাকে যে ফার্মের কাজের বিষয়ে এখনও তেমন ভরসা করা হয় না, তাতে সে রীতিমতো স্বস্তি বোধ করে। নিশ্চিন্তে আড্ডা মেরে বেড়ায়। বাকিদের মনোভাব অশ্রুজিৎ একেবারে বোঝে না এমন নয়। কিন্তু সে এসব গ্রাহ্য করে না। তার এই নির্বিকার ভাবটাও রাধাকে আকর্ষণ করে। নিজের কাছে অস্বীকার করবে না রাধা, অশ্রুজিৎকে সে মনে-মনে পছন্দ করে। কিন্তু এই পছন্দ করাটাকে কি প্রেমের ভাব বলা যায়? উঁহু, না বোধহয়। মনে-মনে ঘাড় নাড়ে রাধা। তবে, প্রেমের কাছাকাছি কিছু একটা হতেও পারে এটা। সে যাই হোক, মনের ভাব সে কারও কাছে কোনওভাবেই প্রকাশ করেনি, অশ্রুজিতের কাছে তো নয়ই। তবু অন্যরা বলাবলি করে, তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু একটা আছে। সেই কারণেই তার এত কদর। কী অপমানজনক! যেন রাধার কোনও এলেম নেই। যেন সে শুধুই একটা সুন্দর দেখতে মেয়ে মাত্র। এসব কানাঘুষোয় মাথা ঘামানোর অর্থ হয় না। আর, গুজবের সবটাই যে সবসময় অসহ্য মনে হয়, তাও নয়। মাঝে-মাঝে একা বসে ভাবতে বেশ লাগে, অশ্রুজিৎ আর সে। দুর! জেগে স্বপ্ন দেখা। যত্তসব!

বছরখানেক পরে সায়নের আর্টিক্‌লশিপ শেষ হল। সি এ পাশ করে সে কলকাতারই এক নামী সংস্থার চাকরি নিল। সায়নের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় বসল রাধা। বসতে যে হবে, তা জানাই ছিল। ততদিনে আর সকলে তাকে দলের নেতা বলে মেনে নিয়েছে। অশ্রুজিৎ আর

তাকে জড়িয়ে কানাকানিও প্রায় মিলিয়ে এসেছে। কারণ আর কিছুই নয়, প্রমাণের অভাব। নেতা হওয়া সত্ত্বেও একটা জায়গায় রাধাকে হার মানতে হল। কলকাতার বাইরে কোথাও অডিট থাকলে তাকে যেতে বলা হত না। সেসব জায়গায় অশ্রুজিৎ অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেত। রাধা বুঝল, সে মেয়ে বলে তাকে এই কাজে সঙ্গে নেওয়া হয় না। কয়েকবার এরকম হওয়ার পর মনখারাপ হয়ে গেল তার। রীতিমতো অপমানিত বোধ করল। অন্যদের কাছে যেন ছোট হয়ে গেল সে। দলের ছেলেরা তার কানে-কানে যেন নিঃশব্দে বিবৃতি দিতে থাকল, তোমার যতই বুদ্ধি এবং প্রতিভা থাক, যতই তুমি কর্মদক্ষ হও না কেন, সেই তো মেয়ে! শেষপর্যন্ত পিছনেই থাকতে হবে। অনেকবার বলি-বলি করেও এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেনি রাধা। আরও বছরখানেক এভাবেই কাটল। তার আর্টিক্‌লশিপের যখন আর বছরখানেক বাকি, তখন একবার এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। অশ্রুজিতের কাছে গিয়ে বলল, "অশ্রুজিৎদা, যদি কিছু মনে না করেন, একটু বলবেন আউট-স্টেশন অডিটগুলোয় কেন কখনও আমাকে যেতে বলা হয় না?"

অশ্রুজিৎ কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে নরম গলায় বলল, "ইউ নো হোয়াই। ডোন্ট ইউ?"

"আমি মেয়ে বলে?"

অশ্রুজিৎ কাঁধ ঝাঁকাল।

"কিন্তু আর্টিক্‌লড ক্লার্কদের মধ্যে আমি তো এখন সিনিয়রমোস্ট।"

অশ্রুজিৎ নীরবে চেয়ে রইল রাধার দিকে। রাধার ভিতর থেকে কেউ গর্জে উঠতে চাইল। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরে কেটে-কেটে বলল, "কেন, আমার কি দুটো চোখ নেই, দুটো হাত নেই, দুটো কান নেই, নাকি আমার বুদ্ধি নেই? মেয়ে বলে কি আমি বিকলাঙ্গ? প্রতিবন্ধী?"

রাধার ভঙ্গিতে এই তিক্ততা, বক্তব্যে এই ঝাঁঝ আগে কখনও অনুভব করেনি অশ্রুজিৎ। সে একটু অবাক হল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কিন্তু, এতে তো তোমারই সুবিধে?"

"কীসের সুবিধে?"

অশ্রুজিৎ বোঝাল, "কলকাতার বাইরে কিছুদিন থাকা মানে সেই ক'দিন তোমার কলেজ কামাই, টিউশন কামাই এবং পড়াশোনা লাটে ওঠা। তাই না?"

"তা হলে সুমন, প্রদীপ্ত এরা সব এই সুবিধে পাবে না কেন? তা হলে সায়নদা কীভাবে এসব ম্যানেজ করে ভাল রেজাল্ট করল? ওরা যেটা পারে, সেটা আমি পারব না কেন? আর, আমি তো প্রতিটি আউট-স্টেশন অডিটে যাওয়ার জেদ ধরছি না। অন্তত, এক-আধটায়..."

"তোমার বাড়িতে ছাড়বে?" অশ্রুজিৎ হেসে জিজ্ঞেস করল।

তার হাসি দেখে ভিতরে-ভিতরে ফের তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রাধা। আবারও নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে-করতে বলল, "ছাড়বে না কেন? বছরখানেক পরেই তো সিএ কমপ্লিট করে আমার চাকরি শুরু করার কথা। চাকরি করতে কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে তা কি কেউ জানে? তখন তো ছাড়তেই হবে!"

"তোমার বাড়িতে এই যুক্তি মানবে?" চিন্তিত মুখে জানতে চাইল অশ্রুজিৎ।

"নিশ্চয়ই," রাধা অপরিসীম আস্থার সঙ্গে জবাব দিল।

"আমি বাবার সঙ্গে কথা বলব। ইফ হি এগ্রিজ...ওয়েল, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।"

"থ্যাঙ্কস," রাধা এতক্ষণে একটু যেন হালকা বোধ করল। পরক্ষণেই কী ভেবে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু, স্যার কি রাজি হবেন? আপনি বুঝিয়ে বলবেন, প্লিজ!"

"যতটুকু বলা যায়, আমি বলব। কিন্তু বাবা রাজি হবেন বলে মনে হয় না," অশ্রুজিৎ ঘাড় নাড়ল।

"কেন?" আবার শক্ত হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল রাধা।

"ওয়েল..." কাঁধ ঝাঁকাল অশ্রুজিৎ।

প্রায় দমবন্ধ করে প্রশ্নটা করে ফেলল রাধা, "আপনি-আমি দু'জন কমবয়সি ছেলে-মেয়ে বলে?"

অশ্রুজিৎ হেসে ফেলল। পরক্ষণেই কী ভেবে হাসি সামলে গম্ভীর হয়ে বলল, "ইউ নো ইট।"

"আপনার নিজেরও ভিতরে কি এই ভয় আছে?"

"না," স্পষ্ট জবাব দিল অশ্রুজিৎ।

রাধা যেন এতটা স্পষ্টতা আশা করেনি। সে "থ্যাঙ্কস" বলে অশ্রুজিতের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

'না'। ছোট্ট এই একটু শব্দ রাধাকে ভাবাচ্ছে। নিজেদের কিউবিকলে ফিরে এসেও সে ভাবতে থাকল, 'না'! ভাবতে চেষ্টা করল, তার নিজের মধ্যে কি ভয় আছে? 'না'। স্পষ্ট উত্তর তার তরফেও। কিন্তু, এই 'না'-এর কিছু তাৎপর্য আছে। কলকাতার বাইরে ওই ক'দিনের নৈকট্যে অশ্রুজিতের সঙ্গে তার সম্পর্কে যদি আব-একটা মাত্রা যোগ হয়, লোকে যাকে প্রেম বলে, তবে তাতে কোনও আপত্তি নেই তার। গত দু'বছর প্রায় প্রতিদিন অফিসে অশ্রুজিৎকে দেখছে সে। তবুও কাজের মাঝে আড়াল থেকে অশ্রুজিতের কণ্ঠস্বর শুনলে সে উতলা হয়ে ওঠে। অশ্রুজিৎ হয়তো করিডরে কারও সঙ্গে কথা বলছে, এদিকে কিউবিকলে বসে তার গলার আওয়াজ শুনে শরীর কেমন যেন করছে, মন বশে থাকছে না। সে সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হচ্ছে এখনই হয়তো কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরবে, ধরুক! কেন ধরছে না এখনও? সব আক্ষেপ চেপে রাধা ভাল মুখে যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে চূড়ান্ত শালীন রুচিবোধ দেখায়। প্রতিটি কাজে অসাধারণ

বুদ্ধিমত্তা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় রাখে। অশ্রুজিৎ সপ্রশংস ভঙ্গিতে নির্ভেজাল তারিফ করে। রাধার আক্ষেপ তবু থেকেই যায়। কলকাতা থেকে দূরে ক'টা দিন পাশাপাশি বাস করতে তাই রাধার ভয় নেই। আছে একরাশ প্রত্যাশা। সেটাই কি তবে আউট-স্টেশন অডিটে জেদ ধরার কারণ? না। রাধার শরীর শক্ত হয়ে যায়। তিক্ত মনে সে ভাবে, জেদটা প্রাপ্য অধিকার আদায়ের। সব মিলেমিশে কেমন জট পাকিয়ে যায় না? একটার থেকে আর-একটা আলাদা করা যায় না। নিজেকে ভুল বোঝার আশঙ্কা আগাগোড়াই রয়ে যায়। তালগোল পাকানো এই কিম্ভূত পরিস্থিতি, এই পেশা ও পেশার বাইরের মন। শরীর শিথিল হয়ে আসে, মন হয়ে ওঠে নির্ভার। সহজ মনে ভাবে রাধা, কাজের জগতের পাওনাগন্ডার বাইরে যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে সে হবে পড়ে-পাওয়া চোদ্দো আনা। এমনটা কি অশ্রুজিৎও কামনা করে না?

ভাবিত চোখে ছেলের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে শেষে গগনবিহারী সান্যাল বললেন, "তুই তা হলে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাস?"

"ঠিক তা নয়," অশ্রুজিৎ জবাব দিল, "রাধা যেতে চায় এবং আমি ওর দাবিটা ন্যায্য বলে মনে করি। ফার্মের আর্টিক্‌লডদের মধ্যে শি'ইজ সিনিয়রমোস্ট অ্যান্ড অলসো দ্য বেস্ট।"

"কিন্তু এতদিন যে কারণে ওকে আমরা বাইরে পাঠাইনি...।"

"সেটা কারণ হিসেবে দাঁড়ায় না। যেহেতু ওর আগে কোনও মেয়ে প্রতিবাদ জানায়নি তাই এতদিন ওই নিয়ম চলছে।"

"বাট অশ্রু..."

"রেস্ট অ্যাশিয়োর্ড বাবা।" অশ্রুজিৎ কিঞ্চিৎ অধৈর্য ভঙ্গিতে বলে উঠল, "কোনও স্ক্যান্ডাল, কোনও ইনসিডেন্ট ছাড়াই আমরা কলকাতা ফিরে আসব, আই প্রমিস ইউ। ট্রাস্ট মি।"

"আই ট্রাস্ট ইউ।"

গগনের কণ্ঠস্বর এমনিতেই ভরাট। আরও যেন ভারিক্কি হয়ে বাজল অশ্রুজিতের কানে। সে খানিকটা অবাক হয়ে তাকাল বাবার মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করল, "তা হলে রাধাকে কি বলে দেব যে..."

"আমাকে একটু ভাবতে দে।" চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে গগন বললেন, "আমি এখন ভাল্লার অফিসে যাচ্ছি। ওখান থেকে যাব ক্লাবে। ইউক্লিড ইনফোটেক-এর মি. মেননের সঙ্গে আমার আর ভাল্লার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দরকারি কাগজপত্র আমি নিয়ে যাচ্ছি। ভাল্লাকেও বলে দিয়েছি কী কী নিতে হবে। ভাল্লার ফাইনান্সের সব রেকর্ডই তো আমাদের কম্পিউটারে আছে। মনে হয় না দরকার হবে, তবে যদি তেমন বুঝি তোকে ফোন করব, যে ইনফরমেশন চাইব, দিয়ে দিবি।"

অশ্রুজিৎ ঘাড় নাড়ল। গগন দরজার দিকে এগোতে-এগোতে বললেন, "ইন দ্য মিনটাইম, রাধার ব্যাপারটা আমি ভাবব, অ্যান্ড উইল লেট ইউ নো।"

রাধা তার কিউবিকল থেকে দেখল, বাবা-ছেলে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলেন। বাবা চলে গেলেন অফিস ছেড়ে, ছেলে নিজের চেম্বারে ঢুকে পড়ল। তার সম্পর্কে কোনও কথা কি হয়েছে দু'জনের মধ্যে? সিদ্ধান্ত কী দাঁড়াল?

ভাল্লার অফিসের দিকে যেতে-যেতে গাড়িতে বসে গগন ভাবছিলেন, আই ট্রাস্ট ইউ অশ্রু। তুই ট্রাস্টওয়ার্দি। এতটা না হলেও পারতিস, অন্তত কিছু ব্যাপারে। পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, আজও একটা প্রেম করলি না। নারীসঙ্গ কাকে বলে জানলি না। এই বয়সে গগন সান্যাল নিজে গোটাচারেক প্রেমে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। সবক'টাই বেশ শরীরী। এর মধ্যে যুগ কত বদলে

গিয়েছে। দুনিয়া এখন অনেক বেশি উন্মুক্ত, উদার। মানসিকতা, মূল্যবোধ সবই অনেকটা অন্যরকম। সুযোগ-সুবিধে তোদের কত বেশি। তোর বয়সি আর পাঁচটা ছেলেকে দ্যাখ। কেরিয়ার যেমন বানাচ্ছে, তেমনই জীবনটাকেও চেটেপুটে উপভোগ করছে। করাই তো উচিত। অভিকেই দ্যাখ, বাইরে চেহারাটা মধুরার মতো নরমসরম হলেও, স্বভাবে কম বয়সের গগন সান্যাল। হুঁ। আর তুই! দেখতে হাট্টাকাট্টা জোয়ান, কাটাকাটা কর্কশ পুরুষালি চোখ-মুখ, অথচ স্বভাবে বুদ্ধদেব। ছেলেটা তো রীতিমতো স্মার্ট। কাজের সূত্রে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় কোনও আড়ষ্টতা নেই। অথচ মেয়ে পটানোর চেষ্টা বিন্দুমাত্রও নেই। গগনের মেয়েবন্ধুর সংখ্যা এবং বেলেল্লাপনার বহর দেখে তাঁর বাবা তাঁকে বলতেন, 'অকালপক্ক হরিতকী'। গগন তাঁর নিজের ছেলেকে কী বলবেন? জ্ঞানবৃদ্ধ শুকদেব? অশ্রু প্রতিভাবান, ওর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা সেই পরিচয় বহন করে। স্কুল-কলেজে সেরা ছাত্র ছিল। কাজেকর্মে অসম্ভব দক্ষ। এতটা নিখুঁত হওয়াও ভাল নয়। এত নিখুঁত কোনও কিছু সন্দেহের উর্ধ্বে হতে পারে না। অশ্রুর সব কিছু প্রায় যান্ত্রিক। একটা কেরিয়ারিস্ট মানুষ কীভাবে যান্ত্রিক হয়? হয় না! বয়সের ধর্মও যেন ওর ক্ষেত্রে অচল। পাশাপাশি অভিকে দেখলে আরও বেশি করে চোখে লাগে ব্যাপারটা। যে বয়সে যা। অভি এখন সঙ্গে মেয়েবন্ধু নিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। রোজ গার্লফ্রেন্ড বদলাচ্ছে। কাজের কথা বললেই কেটে পড়ছে। এই ছেলেই ক'বছর পরে মন দিয়ে কেরিয়ার বানাবে। বে-থা করে সংসারী হবে। এই তো উচ্চবিত্ত অভিজাত পুরুষের জীবন। ছাপোষা মধ্যবিত্ত সতর্কতায় এই জীবন কলঙ্কিত নয়। গাড়ির মধ্যেই অস্বস্তিতে নড়েন-চড়েন গগন। ছেলের কাছে সরাসরি এই কথা জানতে চাওয়াও যায় না। স্ত্রীর কাছে কখনও সখনও ঠারেঠোরে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তিনি। মধুরা প্রথমত ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছেন, মর্মপীড়া

অনুভব করেছেন। কিন্তু পরে তিনিও বাধ্য হয়ে ভেবেছেন। সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে নয়, ভাবনাটা তাঁর নিজের মধ্যেও যেন কোনওভাবে ছিল, হয়তো কোথাও লুকিয়ে ছিল। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, এঁদের কাছ থেকে সান্যাল পরিবারের কথা অনেক শুনেছেন। স্বামীর মতে মত না দিয়েও, নিজেরই অজান্তে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বসেন তিনি। সান্যালদের দীর্ঘ ইতিহাসে চূড়ান্ত কর্মসফল ও চরম ভোগী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। পাশাপাশি, প্রায় নিয়ম করে প্রতিটি প্রজন্মেই এক-আধজন বিবাগী মানুষও থেকেছেন। কালের নিয়মে তাঁদের কেউ পাগল বলে চিহ্নিত হয়েছেন, কেউ-বা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। মধুরা শিউরে ওঠেন। নিজের ছেলে কোনওদিন সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে পারে একথা ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে। অশ্রু মোটেও সেরকম নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "হি ইজ এনজয়িং লাইফ ইন হিজ ওন ওয়ে। মেয়েবন্ধু এখনও নেই। কিন্তু, মাঝেমধ্যে তো পার্টিটার্টিতে যায়, বন্ধুদের সঙ্গে নাচগানও করে। না না, তোমার ধারণা ভুল। কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?"

জানতে চান গগন। পালটা যুক্তি দেখান, "ওসব পার্টি, ম্যানার্স, সোসাল ড্রিঙ্কিং, সোশ্যাল ড্যান্সিং, এসব তো অভ্যেসবশত। ও যে বাড়ির ছেলে, যে সোসাইটিতে ওকে ঘুরতে হয়, তাতে এসব পুরোপুরি অ্যাভয়েড করা যায় না। ও দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। বরং খটকা লাগে, মেয়েদের সঙ্গে মিশেও তাদের প্রেমে কেন পড়ে না ও?"

মধুরা কাতরে ওঠেন, "এমন করে বোলো না, আমার বুক ধড়ফড় করছে।"

গগন বিষণ্ণ মুখে বলেন, "আমারই কি এসব ভাবতে ভাল লাগে? কিন্তু অশ্রুর রকমসকম যে ভাবায়। এই দ্যাখো না, গাড়ি নিয়ে পড়ে থাকতে এত ভালবাসে! ইনফ্যাক্ট, ফার্মে অ্যাকাউন্টস কি ফাইনান্সের কাজ করে যন্ত্রের মতো। তখন ওর মধ্যে কোনও প্যাশন দেখতে

পাই না। বাট, বাড়ির গ্যারাজে তেলকালি মেখে গাড়ি নিয়ে যখন মাতে, তখন হি ইজ সো প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট। অথচ, সেদিন যখন বললাম, 'চাস তো নতুন একটা মডেল আনিয়ে দিতে পারি,' তখন অশ্রু ফ্ল্যাটলি অফারটা রিফিউজ করল। মুখের উপর বলে দিল, 'নতুন মডেলের গাড়ির ইঞ্জিনগুলোর কোনও বিউটি নেই, ওগুলোয় নাকি শুধু ঠাসাঠাসি টেকনোলজি।' বলল, 'আমি গাড়ি ভালবাসি, কিন্তু যে-সে গাড়ি নয়।' কী বলবে? ওর বয়সি অন্য কোনও ছেলে হলে আনন্দে লাফিয়ে উঠত, এমন বাবা পেয়ে ধন্য ধন্য করত। বাট অশ্রু...?" ক্ষোভে মাথা ঝাঁকালেন গগন।

"ওর বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?" প্রশ্নের সুরে পরামর্শ দেন মধুরা।

"বিয়ে?" অবাক চোখে তাকালেন গগন, "এ যুগে পঁচিশ বছর বয়সে একটা ছেলের বিয়ে দেওয়া যায় নাকি? অবশ্য, ও নিজে বিয়ে করতে চাইলে আলাদা কথা। তবে সেটাও ভেবে দেখতে হবে।"

গাড়ির জানলা দিয়ে ব্যস্ত ফুটপাথ দেখলেন গগন। ভাবলেন, আচ্ছা অশ্রু, এই যে বললি, কোনও ইনসিডেন্ট ছাড়াই আমরা ফিরে আসব, আই প্রমিস! তো কীভাবে এমন একটা প্রমিস করে বসলি? ওরে বোকা, প্রেম-ভালবাসা কি বলেকয়ে জীবনে আসে, যে আগে থাকতে তাকে রুখতে তৈরি থাকবি? হিসেব করে এসব জিনিস যেমন হয় না, তেমনই প্ল্যান করে এসব রোখাও যায় না! বড় ভাবিয়ে তুলছিস আমাকে তুই। রাধা ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, সব দিক দিয়েই। ওর প্রেমে না পড়ার কারণটা ঠিক কী? পড়বিই না, এত নিশ্চিত হচ্ছিস কীভাবে? তা হলে কি সত্যিই...?

বিকেল চারটে নাগাদ ক্লাবে মি. ভাল্লা এবং মি. মেননের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন গগন সান্যাল। একঘণ্টা কনফারেন্স রুমে মেনন আর ভাল্লার কোম্পানির ম্যানেজারদের সঙ্গে নিয়ে কাগজপত্রসহ

আলোচনা ও দরকষাকষি চলেছে। ইভেনচুয়ালি দ্য ডিল ওয়াজ সিলড। সবাই খুশি। এসবের মাঝে দু'জনকে 'এক্সকিউজ মি' বলে উঠে গিয়ে অফিসে অশ্রুজিতের নম্বরে ফোন করলেন গগন, "অশ্রু, রাধা তোর সঙ্গে যেতে পারে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওর বাড়ি থেকে পারমিশন চাই। ওকে বলিস, ওর বাবা যেন আমাকে একবার ফোন করেন।"

অপালা প্রবল প্রতিবাদ জানালেন, "অসম্ভব!" সন্দীপকে অনুরোধ করলেন, "তুমি ওদের ফার্মের সঙ্গে কথা বলো। ওদের বোঝাও, রিকোয়েস্ট করো, যেন রাধাকে বাদ দিয়ে এই কাজটায় ফার্মের অন্য কাউকে ওরা পাঠায়। কোনও ছেলে যাক। রাধা কেন? একটা মেয়ের অনেক সমস্যা থাকে, সেটা ওদের বুঝতে হবে।"

সন্দীপ নিজেও এরকমটাই ভেবেছিলেন। স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে গগন সান্যালকে ফোনে এই কথাই জানাবেন স্থির করলেন। রাধা মরিয়া হয়ে বলে উঠল, "ওরা আমাকে পাঠাতে চাননি। আমিই যেতে চেয়েছি। প্লিজ বাবা, তোমরা বাধা দিয়োও না।"

সন্দীপ ও অপালা মেয়ের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, "তুই যেচে নিয়েছিস এই কাজটা?"

রাধা বিক্ষুব্ধ স্বরে বলল, "হ্যাঁ, আমি যেচেই নিয়েছি। সব ধরনের অভিজ্ঞতা আমার প্রয়োজন। আমি এগোতে চাই বাবা! এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না।"

"কিন্তু..."

অনেক চাপান-উতোর চলল এর পর। তরুণী একা লড়াই চালিয়ে গেল দুই মধ্যবয়সির সঙ্গে। সন্দীপ ক্রমশ নিমরাজি হওয়ার লক্ষণ দেখালেন। অপালার 'কিন্তু'র কোনও শেষ নেই। সন্দীপ একসময় নিরালায় স্ত্রীকে বোঝালেন, "রাধা ভুল বলছে না।

ভবিষ্যতে চাকরিবাকরি করবে, কত কাজে কত জায়গায় যেতে হবে। আর, আমরা ওকে ভাল স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়েছি, চার্টার্ড পড়িয়েছি, এখন কথায়-কথায় ওর পায়ে বেড়ি দিতে চাইলে কী করে চলবে?"

অপালা শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে বললেন, "বেশ, তোমরা বাবা-মেয়ে যা ভাল বোঝো করো। পরে ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেল বোলো না যে, আমি বারণ করিনি।"

সন্দীপ একমুহূর্ত থমকে বললেন, "কিছু হবে না।"

রাধা সন্দীপকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, "থ্যাঙ্ক ইউ বাবা! আমি জানতাম, তুমি অমত করবে না।"

সন্দীপ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোর মা-ও অমত করতে চায় না রাধা। শুধু তোর জন্যে চিন্তা করে..."

সেকথা রাধা জানে। কিন্তু এও জানে যে, এই চিন্তাকে জয় করতে হবে।

সন্দীপ রায় গগন সান্যালের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। হেসে-হেসে অনুরোধ করলেন, "সঙ্গে যিনি যাবেন তাঁকে বলবেন একটু যেন খেয়াল রাখেন। মা-বাবাকে ছাড়া এর আগে কখনও কলকাতার বাইরে তো যায়নি।"

এর আগে কখনও প্লেনে চড়েনি রাধা। অশ্রুজিৎ কি সেকথা জানে? সে জানলার ধারের সিটটা দেখিয়ে বলল, "বোসো!"

রাধা কৃতজ্ঞচিত্তে বসল। সিটটা কি অশ্রুজিৎ তাকে ছেড়ে দিল? নাকি ওটা তার নামেই বুক করা হয়েছে? সে যাই হোক, খুশি মনে জানলার বাইরে তাকাল রাধা। অনেক দূরে ওই যে সি-অফ করতে আসা লোকদের ভিড়, ওখানে মা-বাবাও আছেন নিশ্চয়ই। এখান থেকে ওঁদের আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। এয়ারহোস্টেস সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বলল। রাধা সিটবেল্ট হাতে নাড়াচাড়া করতে-

করতে ভাবল, কোথায় কীভাবে বাঁধব? পাশ থেকে অশ্রুজিৎ হাত বাড়িয়ে বেল্ট বেঁধে দিল। বিশাল এই এয়ারপোর্টের মধ্যে প্লেনের ভিতরে বসে বেশ একটা উত্তেজনা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ঝাঁকুনি অনুভব করে চমকে উঠল রাধা। প্লেনটা যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে উড়ছে। অশ্রুজিতের দিকে তাকাতে সে হেসে বলল, "এয়ার-পকেটে পড়েছে। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় নেই।"

ঠিক হয়েও গেল। প্রথম বিমানভ্রমণের উত্তেজনাও একটু-একটু করে থিতিয়ে এল যেন। অশ্রুজিতের দিকে আড়চোখে তাকাল রাধা। সে কী একটা বই গভীর মনোযোগে পড়ছে। রাধাও গোটাকয় বই এনেছে, বেশিরভাগই চার্টার্ড আর বি কম-এর বই। গল্পের বইও গোটাদুই আছে। কিন্তু, সে সবই ব্যাগের মধ্যে। কী বই পড়ছে অশ্রুজিৎ? রাধা এবার ঘাড় ঘুরিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে সরাসরি দেখতে চাইল অশ্রুজিতের হাতের বইখানা। গল্পেরই বই। লেখকের নাম রাধার পরিচিত। অশ্রুজিৎ বই থেকে চোখ তুলে রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, "পড়েছ?"

"না।"

"পড়বে?"

রাধা মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে। আমার পড়া হয়ে গেলে তোমায় দেব।" বলতে-বলতে অশ্রুজিৎ বইটা মুড়ে রাখল। জিজ্ঞেস করল, "কী ধরনের লেখা তোমার ভাল লাগে?"

বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। কলকাতা বিমানবন্দরের তুলনায় ছোট্ট একটুখানি। কিছুক্ষণ আগে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। ভিজে বাতাসে শিরশিরে ঠান্ডা। চা-বাগান কর্তৃপক্ষের পাঠানো গাড়ি নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে চা-বাগান। সুমচু চা-বাগান শিলিগুড়ি থেকে যেতে কার্শিয়াং-এর কিছু আগে পড়ে। সুমচু বাগানের ম্যানেজার

দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বছর চল্লিশের যুবক। নিজের অফিসে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর তিনি বলে উঠলেন, "মি. সান্যাল, সিনিয়র নিজে না এলেও আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম মি. চট্টোপাধ্যায় অন্তত আসবেন। বাগানের অ্যাকাউন্টস কিন্তু বেশ জটিল।"

বোঝা গেল, বয়স্ক, অভিজ্ঞ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের বদলে দুই তরুণ-তরুণীর আবির্ভাবে বেশ অবাক হয়েছেন মি. সিংহ, হয়তো সামান্য ক্ষুব্ধও। রাধা অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে তাকাল অশ্রুজিতের দিকে। সে শান্তস্বরে বলল, "দরকার হলে ওঁরা কেউ নিশ্চয়ই আসবেন। আপাতত আমরাই কাজ করব। অসুবিধে হবে না বোধহয়।"

"হোপ সো," ভাবলেশহীন মুখে জবাব দিলেন মি. সিংহ। বললেন, "আপনারা তা হলে মি. বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের গেস্টহাউসে চলে যান। আজকের দিনটা রেস্ট নিন, আগামী কাল থেকে কাজ শুরু করুন।"

"থ্যাঙ্কস!" অশ্রুজিৎ বলল, "গেস্টহাউসে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। তবে আমরা আজ থেকেই শুরু করতে চাই, আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়।"

"আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। বেশ তো, ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসুন! এখানে কাগজপত্র সব রেডি থাকবে। আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট মি. রাইয়ের সঙ্গে তখনই আলাপ করিয়ে দেব।"

গেস্টহাউসে পাশাপাশি দুটো ঘর দু'জনকে দেওয়া হয়েছে। শোওয়ার ঘর, বসার ঘর, পড়ার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি মিলিয়ে এক-একটা সুট। স্নান সেরে গেস্টহাউসের বিশাল ডাইনিং রুমে খাওয়ার টেবিলে বসে দেখা গেল এলাহি ব্যবস্থা। এমন খাতিরের অভিজ্ঞতা রাধার এই প্রথম, অশ্রুজিতের নয়। অফিসে পৌঁছে আলাপ হল বাগানের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদম রাইয়ের সঙ্গে। মি.

রাই পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোক। কবে কোন কালে বিকম পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছেন। ক্রমে পদোন্নতি হয়ে হালে বাগানের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছেন। কথা বলেন কম এবং অতি মৃদুস্বরে। মি. সিংহ বললেন, "কাগজপত্র আপনাদের যা লাগবে সবকিছুই উনি জোগান দেবেন। প্রয়োজনে মি. বিশ্বাস আর আমি তো আছিই।"

"ধন্যবাদ! চেষ্টা করব আপনাদের যথাসম্ভব কম বিব্রত করতে," মি. সিংহকে আশ্বস্ত করতে চাইল অশ্রুজিৎ।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। ঠান্ডা গলায় বললেন, "নো, ইটস ওকে, এনিথিং ইউ নিড, এনিটাইম।"

কাজ শুরু করে অচিরেই বোঝা গেল বাগানের অ্যাকাউন্টস অত্যন্ত জটিল। বড় ব্যবসায় হিসেবের খাতায় জটিলতা কিছু থাকেই। তবে এক্ষেত্রে বোধহয় ইচ্ছে করেই জটিলতা একটু বাড়ানোও হয়েছে। তা ছাড়া, পদম রাইয়ের বুককিপিং-এর পদ্ধতিও আদ্যিকালের। সব মিলিয়ে রীতিমতো হিমশিম পরিস্থিতি। রাধা ঘাবড়ে গেল। অশ্রুজিৎ তার চোখ-মুখ দেখে আশ্বাস দিল, "ভয় পেয়ো না। এসব জায়গায় এটাই দস্তুর। ইটস ডিফিকাল্ট, বাট নট ইমপসিবল। এই উদ্দেশেই আমাদের ডাকা। স্মিথ-সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানিকে এরা বিনা কারণে মোটা ফিজ় দেয় না।"

রাধা জানত অশ্রুজিতের কর্মসংস্কৃতি ভীষণই আঁটসাঁট। কলকাতার অফিসে সে আসে সকলের আগে। বাইরে অডিট না থাকলে অফিস থেকে বেরোয় সকলের শেষে। এর মধ্যে এক মুহূর্তও বিনা কাজে নষ্ট করে না। অশ্রুজিতের পরিশ্রম করার ক্ষমতা অমানুষিক। রাধা দেখল, কলকাতার বাইরে এসেও তার কোনও খামতি নেই। বরং এখানে সে পরিশ্রম আরও বেশি করছে। বাধ্য হয়ে রাধাকেও সমানভাবে খাটতে হচ্ছে। অশ্রুজিৎ অবশ্য প্রথম দিনই বলেছিল, "আমি যতক্ষণ যতটা কাজ করছি, তোমাকেও

ততটাই করতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। তুমি একটু পরে অফিসে এসে, একটু আগেও বেরিয়ে যেতে পারো!"

"কেন?" রাধা ভ্রূ কুঁচকে জানতে চেয়েছিল, "আমি মেয়ে বলে এই সুবিধে?"

অশ্রুজিৎ শান্তভাবে জবাব দিয়েছিল, "তোমার জায়গায় কোনও ছেলে থাকলে তাকেও আমি একই কথা বলি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করানোয় আমার সায় নেই।"

রাধা তর্ক বাড়ায়নি। অশ্রুজিৎও আর এ বিষয়ে কখনও কিছু বলেনি। বলেনি যে, ঠিক 'আছে রাধা, আজ অনেক পরিশ্রম করেছ, যাও একটু রেস্ট নাও।' প্রতিদিন দু'জনে স্নান এবং প্রাতরাশ সেরে একসঙ্গে গেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে বাগানের অফিসে পৌঁছোয় সকাল আটটায়। সেখানে কাজ চলে সন্ধে সাতটা, কোনও-কোনওদিন রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত। মাঝখানে দুপুরে আধঘণ্টা, কখনও বড়জোর ঘণ্টাখানেকের বিরতি মধ্যাহ্নভোজনের। বাগানের ম্যানেজার দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ইতিমধ্যে হাবভাবে তাদের প্রতি রীতিমতো সমীহ দেখাতে শুরু করেছিলেন। অশ্রুজিতের কর্মদক্ষতা এবং অ্যাকাউন্টের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তার কৌশল তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাধার বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিও। দেবেন সিংহের এই মনোভাব অশ্রুজিৎ কীভাবে গ্রহণ করেছিল, বলা যায় না। কারণ, তার তরফে আচরণে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। রাধা কিন্তু মনে-মনে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করেছিল।

সেদিন সকাল ছ'টা নাগাদ নিজের বিছানা থেকে জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা পৃথিবীকে তাকিয়ে রাধা দেখেছিল। ট্র্যাকসুট-পরা অশ্রুজিৎ কুয়াশা ভেদ করে গেস্টহাউসের দিকে ধীরগতিতে ছুটে আসছে। পরদিন ভোরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছিল। রাধা দেখল, অশ্রুজিৎ বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে পায়চারি করে

ফিরল। ছ'টা বাজার কিছু আগে নিজের ঘরে ফিরে গেল। রাধা ট্র্যাকসুট আনেনি। শর্টস এনেছিল। তার পরদিন সেটা পরে পৌনে পাঁচটা নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেস্টহাউসের বারান্দায় একপাশে বেঞ্চিতে অন্ধকারে মিশে বসে রইল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়নি। রাধা মনে-মনে ভাবছিল, সকালে যেন বৃষ্টি না হয়, আরও ঘণ্টাখানেক আকাশ যেন পরিষ্কার থাকে। অশ্রুজিৎ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে শুনতে পেল, পিছন থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর, "আমিও যাব।"

অশ্রুজিৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "এসো।"

অশ্রুজিৎ বেশ জোরে দৌড়োয়। আধঘণ্টা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে রাধা হাঁফিয়ে গেল। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, "উঃ, আর পারছি না, কোথাও একটু বসা যায় না?"

"এখানে না, আর-একটু পরে," দৌড়োতে-দৌড়োতেই বলল অশ্রুজিৎ।

"আপনি যান, আমি এখানেই বসি," রাধা পায়েচলা রাস্তার পাশে ঘাসজমিতে বসে পড়ল। অশ্রুজিৎ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত ফিরে এসে রাধাকে টেনে তুলল। রাধা অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। অশ্রুজিৎ তার হাত ছেড়ে দিয়ে হাসল। বলল, "দৌড়োতে হবে না। চলো, একটু হাঁটি। কিন্তু এখানে বসা চলবে না।"

"কেন?"

"জোঁক।"

"জোঁক?"

"প্রচুর, অজস্র, ঝাঁকে-ঝাঁকে জোঁক। পাঁচ মিনিটে ছেঁকে ধরবে, বুঝতেও পারবে না। যখন বুঝবে তখন দেখবে শরীরের কোথাও না-কোথাও ওরা রক্ত খেয়ে মোটা হয়ে ঝুলছে।"

"উরে বাবা," রাধা ব্যস্ত হয়ে টি শার্ট এবং শর্টস দু' হাতে ঝাড়া দিতে শুরু করল। অস্থির ভঙ্গিতে জুতো পরা দু'পা জমিতে ঠুকল

কয়েকবার। মনে হল, শরীরের কোথাও যেন সুড়সুড় করছে, কেমন যেন চুলকোচ্ছে।

"আরে! তোমাকে ধরেনি ওরা এখনও?" অশ্রুজিৎ আশ্বস্ত করে বলল, "চলো, এগোই।"

"চলুন।" রাধা লজ্জা পেয়ে বলল। তার অস্বস্তি তখনও যায়নি। অশ্রুজিৎ তখন দ্রুত পায়ে হাঁটছে। তার পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে রাধা ভাবল, "এই পরিস্থিতিতে দৌড়োনো বরং ভাল! জোঁকের এলাকাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচা যায়।"

কিছুক্ষণ হাঁটার পর পথের ধারে পড়ে থাকা একটা লম্বা-চওড়া পাথরের সামনে থামল অশ্রুজিৎ। বলল, "এখানে এই পাথরের উপরে নিশ্চিন্তে বসা যায়। চলো বসি।"

রাধা পাথরের উপরে উঠে বসতে অশ্রুজিৎ বলল, "ওদিকে মুখ না করে, এদিকে ঘুরে বোসো।"

রাধা বলল, "কেন?"

"এদিকটা পূর্ব দিক, এখনই সূর্য উঠবে! দেখবে না?"

রাধা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "দেখব তো, কখন সূর্য উঠবে?"

"এই তো, আর মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই উঠবে।"

আধঘণ্টা আগের অন্ধকার ভাবটা অনেকটা কেটেছে। এখন কেমন একটা অবাস্তব, প্রায় অলৌকিক আলোয় ভাসছে পৃথিবী। সূর্য উঠছে। গলে গলে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে চারপাশ। কাছের পৃথিবী হঠাৎ স্পষ্ট ও পবিত্র হয়ে উঠল। সূর্য এখন দিগন্তের অনেক উপরে।

"চলো, ফেরা যাক।"

রাধা যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় ঘুরে তাকাল। চোখে এখনও তার ঘোর। চলো, ফেরা যাক, কথাটা কি অশ্রুজিৎই বলল?

"ফিরে রেডি হয়ে অফিস," আর কোনও সন্দেহ নেই। অশ্রুজিৎই। মুখটা হাসিহাসি। ইতিমধ্যেই পাথর থেকে নেমে

দাঁড়িয়েছে। রাধা পাথর থেকে পিছলে নামতে-নামতে বলল, "কাজ এত ভাল লাগে আপনার?"

"কাজই তো জীবন," রাধার পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বলল অশ্রুজিৎ।

"জীবনে কাজ ছাড়া আর কিছু কি নেই?"

"আছে হয়তো, সেগুলো আলাদা করে খুঁজতে যাই না।"

"সামনে এসে দাঁড়ালে?"

"তখন দেখব!"

দুই তরুণ-তরুণী যখন গেস্টহাউসের চৌহদ্দিতে ঢুকছে তখন টিপটিপিয়ে বৃষ্টি নামল।

অফিসে তাদের জন্য বরাদ্দ কামরায় বসে দেবেন সিংহের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল অশ্রুজিৎ এবং রাধা। জানলার কাচের পাল্লা দিয়ে দেখতেও পাচ্ছিল তাঁকে। ভদ্রলোক অফিসের সামনে তাঁর গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে ধমকাচ্ছিলেন গুটিকয় কর্মীকে। কিছুক্ষণ দেখার পর অশ্রুজিৎ একজন বেয়ারাকে ডেকে জানতে চাইল কী হয়েছে।

সে জানাল, "সিংহসাহেব দার্জিলিং যাবেন, কিন্তু হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার-মেকানিক কেউ বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। সাহেব তাই চটে গিয়ে তাদের ধমকাচ্ছেন।"

অশ্রুজিৎ উঠে দাঁড়াল, "দেখি কী হয়েছে?" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেবেন সিংহ তার দিকে তাকালেন। একটু হাসলেন। অশ্রুজিৎও হাসল। বলল, "গাড়ি বিগড়েছে?"

"কী আর বলব? দার্জিলিং-এর প্ল্যান্টার্স ক্লাবে জরুরি মিটিং আছে। অথচ...এই অপদার্থরা গোলমালটা কোথায়,সেটাই বুঝতে পারছে না। এদিকে সব গাড়ি বেরিয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু

ওটা," দেবেন সিংহ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা আদ্যিকালের রংচটা পিকআপ ভ্যান দেখালেন।

"ওটা কিন্তু অনেক ভাল গাড়ি," অশ্রুজিৎ হেসে বলল।

"ভাল গাড়ি!" দেবেন সিংহ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বললেন, "ইউ মিন মোর হার্ডি?"

"আই মিন মোর বিউটিফুল।"

অশ্রুজিতের কণ্ঠস্বরে ইয়ারকির ছোঁয়া নেই বুঝে দেবেন সিংহের বিস্ময় আরও হয়তো বাড়ল। অশ্রুজিৎ গাড়ির খোলা বনেটের উপরে ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"বুঝতে পারছি না স্যার। অ্যাক্সিলারেটর ধরছে না।"

অশ্রুজিৎ গাড়িতে ড্রাইভারের আসনে বসে চাবি ঘোরাল। গাড়ির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। অ্যাক্সিলারেটর আর ক্লাচ দাবাতে-দাবাতে মিনিটখানেক সেই গর্জন শুনল। শেষে ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে জামার হাতা গুটিয়ে গাড়ির যন্ত্রপাতি ঘাঁটতে শুরু করল। পিছন থেকে দেবেন সিংহ গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনি কেন অযথা কষ্ট করছেন মি. সান্যাল? লিভ ইট।"

"কষ্টের কিছু নেই!" অশ্রুজিৎ ঝুঁকে এটাসেটা নাড়াচাড়া করতে-করতে আনমনে বলল, "একটু দেখছি শুধু, যদি...।"

"না না, মি. সান্যাল, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু টেক দ্য ট্রাবল। তা ছাড়া এই ড্রাইভার-মেকানিকরা যখন ব্যাপারটা ধরতে পারছে না তখন আপনি..."

অশ্রুজিৎ ঘুরে তাকাল দেবেন সিংহের দিকে, "ইটস নট আ ট্রাবল ফর মি। গাড়ি আমার প্যাশন। তবে আপনি যদি না চান যে, আপনার গাড়িতে আমি...।"

"নো নো, ইটস নট দ্যাট, বাট..." অস্বস্তিভরা গলায় কিছু বোঝাতে গেলেন দেবেন সিংহ। অশ্রুজিৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার কুণ্ঠার কোনও কারণ নেই," সে আবার গাড়ির উপর ঝুঁকে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক বাদে অশ্রুজিৎ বনেট বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলল, "চালিয়ে দ্যাখো!"

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এসে একগাল হেসে বলল, "একদম ঠিকঠাক স্যার!"

দেবেন সিংহ এগিয়ে গেলেন অশ্রুজিতের দিকে। আনন্দে হয়তো তাকে জড়িয়ে ধরতেন। তার পোশাকে ও শরীরে ইতস্তত ঘন গ্রিজের পোঁচ দেখে থমকে দাঁড়ালেন. "আই অ্যাম সো গ্রেটফুল টু ইউ মি. সান্যাল। বলুন, কীভাবে এই ঋণ আমি শোধ করতে পারি?"

"ঋণের প্রশ্নই ওঠে না! সামান্য ব্যাপার। অ্যান্ড, ইট ওয়জ় মাই প্লেজার।"

"মি. সান্যাল, কখনও যদি মনে হয় আই মে বি অফ এনি হেল্‌প, আমাকে শুধু একবার বলবেন।"

অশ্রুজিৎ হেসে ফেলল, "ঠিক আছে, মনে থাকবে।"

"আমারও থাকবে মি. সান্যাল। আমি রাজপুত, কথার দাম আমার কাছে জীবনের চেয়েও বেশি।"

অশ্রুজিতের হাসি মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস মি. সিংহ!"

"ইউ আর ওয়েলকাম। অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড ডে," দেবেন সিংহ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, "চলো, আই অ্যাম অলরেডি লেট।"

গাড়ি-বিষয়ক ঘটনার পর থেকে দেবেন সিংহ অশ্রুজিতের প্রতি আরও বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। বয়সে অশ্রুজিৎ নিতান্তই নবীন। দেবেন সিংহ সেখানে মধ্যবয়স্ক যুবক। দেবেন সিংহ নির্দ্বিধায় অশ্রুজিতের সঙ্গে সমবয়স্কের ভঙ্গিতে দেশ, দশ, ব্যাবসা, রাজনীতি, বই, ফিল্ম, গান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা এবং এমনকী, হাসি-মশকরা শুরু করলেন। রাধার বরাবরই মনে হত, আবারও

নতুন করে মনে হল যে, অশ্রুজিৎ যেন তার বয়সের তুলনায় মানসিকভাবে অনেকটা বেশি পরিণত। সে যখন অনায়াসে দেবেন সিংহের রসিকতার জবাব দেয়, কিংবা কোনও জটিল বিষয়ে নিজের মত জাহির করে, তখন তাকে দেবেন সিংহের সমবয়সি মনে হয়। রাধার মনে হল, অশ্রুজিৎ যদি আমার সঙ্গে আর-একটু বন্ধুর মতো ব্যবহার করত, যদি অন্তত আমাকে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামতে দিত! দেখতে-দেখতে প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। সুমচু টি এস্টেটে রাধাদের কাজও প্রায় শেষ। শেষ মুহূর্তের কিছু হিসেবনিকেশ চলছে। আগামি কাল কী একটা স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে বাগানে ছুটি। অফিস বন্ধ। পরশু সকালে ব্যালান্সশিটে সই করবে অশ্রুজিৎ। তারপরই বাগানের গাড়িতে দু'জনে রওনা হবে বাগডোগরা। আগাম প্লেনের টিকিট কাটা আছে। আগামী পরশু বিকেলের আগেই কলকাতা পৌঁছে যাবে রাধা। আবার সেই কলকাতা, আবার সেই নাগরিক জীবন!

বাগানের হিসেবপত্রের অডিট সফল ও নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ায় দেবেন সিংহ খুশি হয়ে আজ বিকেলে বাগানে একটা পার্টি দিচ্ছেন। বাগানের বাইরে থেকে অনেকেই যোগ দিতে আসবেন। পার্টিতে রাধা আর অশ্রুজিতেরও নিমন্ত্রণ।

"আমি নয় পার্টিতে না-ই গেলাম। মি. সিংহ কি ক্ষুণ্ণ হবেন?" অফিস থেকে বেরোনোর আগে টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে-গোছাতে বলে উঠল রাধা।

"তা হয়তো একটু হবেন। তবে তোমার অসুবিধে থাকলে, কোনও কথা নেই।"

অশ্রুজিৎ ভাবল, মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে, পার্টি সম্পর্কে একটা রক্ষণশীল মনোভাব হয়তো রাধার মনে কাজ করছে।

"তেমন কিছু অসুবিধে নেই, পার্টিটার্টি আমার ভালই লাগে!" ফিক করে হেসে একটু যেন লাজুক মুখে জানাল রাধা, "কিন্তু

পার্টিতে পরার মতো ড্রেস তো আমি সঙ্গে আনিনি। এই জিনস আর টি-শার্ট পরে...”

“এটা একটা সমস্যা ঠিকই,” অশ্রুজিৎ তার দিকে তাকিয়ে সায় দিল, “তবে, মি. সিংহ পার্টির ড্রেস-কোড সম্পর্কে কোনও ফতোয়া দেননি। মনে হয় জিনস-টি-শার্টে গেলেও কেউ মাইন্ড করবে না।”

রাধা তবুও কিন্তু-কিন্তু করতে থাকল। অশ্রুজিৎ বুঝল, পার্টিতে যাওয়ার ইচ্ছে রাধার ষোলোআনা। কিন্তু প্রতিদিনের আটপৌরে পোশাকে তাকে সেখানে দেখে পাছে কেউ ভুরু কোঁচকায়, এই সংকোচে ভুগছে।

“ঠিক আছে, মি. সিংহকে জিজ্ঞেস করে দেখি, এখানকার পার্টিতে ড্রেস-কোডের ব্যাপারটা ঠিক কী?”

রাধা গেস্টহাউসে ফিরে গেল। অশ্রুজিৎ ঢুকল দেবেন সিংহের চেম্বারে। প্রশ্ন শুনে দেবেন সিংহ হেসে ফেললেন। বললেন, “সাহেবদের আমলের বাগান, ড্রেস-কোডটোড সবই ছিল একসময়, এখন আর কেউ ওসব নিয়ে তত মাথা ঘামায় না।”

“বাঃ, রাধার টেনশনের কোনও কারণ নেই তা হলে।”

অশ্রুজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল। দেবেন সিংহ হাত নেড়ে বাধা দিলেন তাকে, “ওয়েট ব্রাদার, সিট ডাউন।”

অশ্রুজিৎ ফের বসে পড়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

“তোমার রাধার সমস্যাটা অন্য জায়গায়,” দেবেন সিংহ জানালেন,“জিনস পরে ও নিজেই আসতে চায় না। আফটার অল, শি ইজ় আ উওম্যান। পার্টিতে যাবে তো, প্রপার পার্টিওয়্যার পরেই যেতে চাইবে, তাই না?”

“তাই কি?”

“হানড্রেড পারসেন্ট তাই।”

“সে তো এখন করার কিছু নেই।”

"ডোন্ট সে, করার কিছু নেই," দেবেন সিংহ যেন মৃদু ভর্ৎসনা করলেন, "তোমার মতো এন্টারপ্রাইজ়িং ইয়ংম্যানের মুখে এই কথা মানায় না। কার্শিয়াং বাজার এখান থেকে গাড়িতে আধ ঘণ্টার রাস্তা। টেক মাই কার, গো দেয়ার অ্যান্ড বাই আ ড্রেস ফর হার।"

অশ্রুজিৎ আকাশ থেকে পড়ে বলল, "আমি? এখন?"

"অফকোর্স। হোয়াই নট? শিয়োরলি ইউ ক্যান ডু দিস লিটল থিং ফর ইয়োর ওম্যান।"

"আঃ! শি ইজ় নট মাই ওম্যান।"

"হোয়াই নট?"

অশ্রুজিৎ অস্বস্তিতে পড়ল। দেবেন সিংহের প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "সে যাই হোক, রাধাকে একটা ড্রেস কিনে দেওয়া বড় কোনও কথা নয়। কিন্তু, এখন এভাবে...রাধারও অদ্ভুত লাগবে। ও ভাবতেই পারে না, আমি এমন কিছু করতে পারি।"

"মেয়েরা যে কখন কার সম্পর্কে কী ভাবে, সে বিষয়ে তোমার কোনও ধারণা নেই," দেবেন সিংহ হেসে বললেন, "তুমি চ্যাম্পিয়ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে পারো, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে দেখছি বড়ই অজ্ঞ।"

"মে বি, কান্ট হেল্প ইট।"

"পারলে আমিই কার্শিয়াং গিয়ে ওর ড্রেস কিনে আনতাম। কিন্তু, আজ আমার উপায় নেই। বাইরে থেকে অনেকেই আসবেন, আমি হোস্ট, সবাইকে রিসিভ করতে হবে।"

"লিভ ইট মি. সিংহ," বিরক্তি চেপে শান্তস্বরে বলল অশ্রুজিৎ, "যে কোনও পোশাকেই যখন যাওয়া যায়, তখন আমি অন্তত আর কোনও অসুবিধে দেখছি না।"

দেবেন সিংহ বললেন, "এক কাজ করা যাক, আমি কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে রাধাকে সঙ্গে করে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে

যাবে। আমি জানি, আমার স্ত্রীর ওয়ার্ডরোবে অসংখ্য পার্টিওয়্যার আছে। সেখান থেকে একটা ড্রেস রাধা পছন্দ করে নিক। মিসেস সিংহকে আমি ফোন করে দিচ্ছি।"

"এর কি কোনও প্রয়োজন আছে?"

"আছে মনে হয়। অ্যান্ড মিসেস সিংহ উইল বি টু হ্যাপি টু হেল্প হার।"

অশ্রুজিৎ গেস্টহাউসে ফিরে রাধাকে দেবেন সিংহের প্রস্তাবটা জানাতে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে উৎসুক চোখে অশ্রুজিতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?"

"সে তোমার ব্যাপার। তুমি ঠিক করবে।"

রাধার মুখ কালো হয়ে গেল। সে অস্ফুটে বলল, "থাক তা হলে!"

রাধার মুখ মুহূর্তে ম্লান হয়ে উঠতে অশ্রুজিৎ বিব্রত বোধ করল। সে তাড়াতাড়ি বলল, "না না, থাকবে কেন? উনি তো নিজেই অফার করছেন। এভাবে ওঁরা তোমাকে সম্মান দেখাচ্ছেন, ইট্স অ্যান অনার। অ্যাকসেপ্ট না করার কিছু নেই।"

"নিই তা হলে ড্রেসটা?"

"কী মুশকিল!" অশ্রুজিৎ ভাবল, আমি তোমাকে অনুমতি দেওয়ার কে? তোমার সিদ্ধান্ত আমি কেন দেব? মুখে বলল, "নাও।"

রাধা বলে উঠল, "তা ছাড়া, আমি তো ওটা বরাবরের জন্যে নিয়ে নেব না। পার্টি শেষ হলেই ফেরত দিয়ে দেব।"

"সেটাও ঠিক!"

অশ্রুজিৎ রাধার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, রাধা পিছন থেকে ডাকল, "আচ্ছা অশ্রুজিৎদা, এই পার্টিতে কি লোকে নাচগান করবে?"

অশ্রুজিৎ থমকে তাকাল রাধার দিকে, "তা কেউ-কেউ করবে বোধহয়, মি. সিংহ তো এটা বল পার্টিই দিয়েছেন।" এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাচতে ভাল লাগে?"

"ভীষণ!"

"নাচ শেখো?"

"বছরতিনেক আগে পর্যন্ত পাড়ায় একজনের কাছে রেগুলার ভরতনাট্যম শিখেছি," লাজুক মুখে জানাল রাধা।

"ছেড়ে দিলে কেন?"

"কলেজের পড়ার চাপ, সিএ, আর্টিক্‌লশিপ, সময় কোথায়? বাড়িতেও 'বলল, যথেষ্ট নাচ শেখা হয়েছে!' আমিও দেখলাম, একসঙ্গে সবকিছু হয় না..."

অশ্রুজিৎ মাথা নাড়ল। রাধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "আজ খুব ইচ্ছে করছে এই পার্টিতে সকলের সঙ্গে নাচতে।"

"তো, নাচবে।"

"দুর! আমি তো ওয়েস্টার্ন ডান্স জানি না।"

"ওয়েস্টার্ন ডান্স!" অশ্রুজিৎ হাসল, বলল, "মি. সিংহের এই পার্টিতে কারা আসবে জানি না, তবে বেশিরভাগ জায়গাতেই আজকাল দেখি, জোরে হিন্দি গান বাজিয়ে সবাই এলোপাথাড়ি নাচে। সে কী নাচ বলা মুশকিল। ওটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

"না, ওরকম নয়," রাধা মাথা নাড়ল, "টিভিতে-সিনেমায় দেখেছি বলরুম ডান্স। যদি ওরকম নাচতে পারতাম!"

অশ্রুজিৎ এক মুহূর্ত রাধাকে দেখে বলল, "একসময় ভরতনাট্যম শিখেছ যখন, গোটাকয় বলরুম ডান্স আয়ত্ত করতে তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।"

"আপনি নাচ জানেন?"

অশ্রুজিৎ হাসল। সে যে বাড়ির ছেলে, তাতে দু'-চারখানা কেতাদুরস্ত সোশ্যাল ডান্সের স্টেপ না জানাটাই অস্বাভাবিক।

ছেলেবেলা থেকে আকছার কখনও বাড়িতে, কখনও ক্লাবে পার্টি দেখে বেড়ে উঠেছে। একসময় কিছুদিনের জন্য নিয়ম করে সামান্য শিখতেও হয়েছে। সে জবাব দিল, "ওই একটুআধটু জানি।"

"আমাকে একটু শিখিয়ে দিন না, আজ মিউজিকের সঙ্গে এক-দুটো স্টেপও যদি মেলাতে পারি? এখনও তো দেরি আছে পার্টির, তার আগে কিছু মুভমেন্ট তুলতে পারব না?"

অশ্রুজিৎ কয়েক মুহূর্ত রাধাকে দেখে বলল, "পারবে। এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। ফক্স ট্রট সবচেয়ে সোজা, লেটস ট্রাই ইট। একটু মিউজিক হলে ভাল হত।"

"কী ধরনের মিউজিক?"

"যে-কোনও ধরনের। একেবারে ভাংড়া গোছের মিউজিক ছাড়া প্রায় সব ধরনের গানের সঙ্গেই ফক্স ট্রট নাচা যায়।"

"আমার সঙ্গে ট্রানজিস্টার আছে। দেখব, কোনও স্টেশনে ভাল কোনও গান হচ্ছে কি না?"

"দ্যাখো। নইলে নিজেরাই 'পুরানো সেই দিনের কথা' গেয়ে তার সঙ্গে নাচব।"

রেডিয়োতে খুঁজে পেতে একটা স্টেশন পাওয়া গেল, যেখানে তখন একটার পর-একটা রোম্যান্টিক গান বাজানো হচ্ছে। অশ্রুজিৎ নাচের মুভমেন্ট এবং স্টেপগুলো বুঝিয়ে দিল, "এক-দুই-তিন-চার সামনে, এক-দুই-তিন-চার পাশে..."

রাধা মনোযোগী ছাত্রীর মতো মাথা নাড়ল, "মনে হচ্ছে বুঝেছি।"

অশ্রুজিৎ এগিয়ে এসে এক হাতে রাধার কোমর ধরে তার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের কোমরে রাখল। নির্দেশ দিল আর-এক হাত তার কাঁধে রাখতে। নির্দেশ পালন করতে-করতে রাধা আড়চোখে অশ্রুজিতের মুখের দিকে তাকাল। তার নিজের বুক তখন অশ্রুজিতের শরীরের ছোঁয়ায় বুনো ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে

উঠেছে। মুখে-চোখেও উত্তেজনার ঈষৎ ছাপ! কিন্তু অশ্রুজিতের মুখ ভাবলেশহীন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফক্স ট্রট নাচে বেশ সড়গড় হয়ে উঠল রাধা। মনে হল, সত্যিই, এমন কিছু ব্যাপার নয়, এ তো প্রায় হাঁটা, তালে-তাল মিলিয়ে হাঁটা। মুভমেন্টগুলো মনে রাখা দরকার। তা থাকবে। সে অশ্রুজিৎকে বলল, "আর-এক ধরনের নাচ আছে না, প্রায় এই রকমই, কিন্তু আর-একটু ফাস্ট, মধ্যে-মধ্যে স্লাইডিং, গ্লাইডিং আর হোয়্যার্লিং মুভমেন্ট?"

অশ্রুজিৎ হেসে বলল, "ভিয়েনিজ় ওয়লজ়। ওটা বেশ ডিফিকাল্ট। পরে কোনওদিন দেখা যাবে। এক সন্ধের জন্য ফক্স ট্রটই যথেষ্ট।"

ইতিমধ্যে দেবেন সিংহের লোক রাধাকে ডাকতে এল। রাধা তার সঙ্গে গেল দেবেন সিংহের কোয়ার্টারে। অশ্রুজিৎ রাধার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। পশ্চিমের মেঘলা আকাশে লালচে আভা দেখে বোঝা যায়, সেখানে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবছে। বর্ষার আকাশের মতোই ভার হয়ে এল অশ্রুজিতের মন। মনে হল, দেবেন সিংহের গাড়ি নিয়ে কার্শিয়াং চলে গেলেই ভাল হত!

পার্টি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মিসেস সিংহ খবর পাঠালেন, তিনি রাধাকে সঙ্গে নিয়ে পার্টিতে যাবেন। অশ্রুজিৎ যেন যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে যায়। বাগানের বলরুমে পৌঁছে অশ্রুজিৎ দেখল, ইতিমধ্যে অনেকেই সেখানে হাজির হয়েছেন। দেবেন সিংহ নিজেও আছেন, অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন। অশ্রুজিৎকে তিনি অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে-করতে বলরুমের চারদিকে তাকিয়ে রাধাকে কোথাও দেখতে পেল না অশ্রুজিৎ। দেখল, বড় হলঘরটা বেশ সাজানো হয়েছে। ঘরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও দেখার মতো। রুমহিটার

আর ব্লোয়ারের বদলে এখানে সেকেলে ফায়ার প্লেসে জ্বলছে গনগনে আগুন। আগুন অন্যত্রও ছিল। মিনিট দশেক পরে সেই অন্য আগুনের আঁচ পেল অশ্রুজিৎ। রাধাকে সঙ্গে নিয়ে মিসেস সিংহ বলরুমে এলেন। একেই বলে, মঞ্চে প্রবেশ। আর সকলের মতো অশ্রুজিৎও মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সেদিকে। সোনাল সিংহ ভীষণ সুন্দরী, সকলেই তাঁকে চেনে। আজ সকলে দেখছিল তাঁর সঙ্গের মেয়েটিকে। বর্ষার সন্ধেয় মেঘরঙা লম্বা ফ্লোয়িং ইভনিং ড্রেসে অসাধারণ দেখাচ্ছিল রাধাকে। চারপাশ স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। রাধা অশ্রুজিৎকে দেখে হাসল। অশ্রুজিৎ হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বোঝাল, দারুণ লাগছে। খুশিতে মুখ লাল হয়ে উঠল রাধার, চোখ হয়ে উঠল আরও উজ্জ্বল।

অশ্রুজিতের আশঙ্কাই সত্যি হল। দেবেন সিংহ পার্টিতে পেশাদার গানের ব্যান্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপস্থিত জনতার অনুরোধে সেই ব্যান্ড একের পর-এক চলতি ফিল্মি গান শোনাতে শুরু করল। আর সেই গানের সঙ্গে সে কী মাতোয়ারা নাচ। মানুষজন হাত-পা ছুড়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পরদার নাচ বলরুমের ফ্লোরে নামিয়ে আনতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গেল। বড় মর্মান্তিক! ভাবল অশ্রুজিৎ!

রাধা চুপটি করে কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে চেয়ে অশ্রুজিৎ কাঁধ ঝাঁকাল। রাধা হাসল। বলল, "এভাবে নিজে নাচতে ইচ্ছে করে না ঠিকই, কিন্তু এতেও কোনও দোষ নেই," অশ্রুজিতের চোখে প্রশ্ন দেখে সে বোঝাল, "অনেকেই হয়তো নাচ জানে না, কোনওদিন শেখেনি, তবুও নাচতে ইচ্ছে করে। তারা আর কী করবে?"

অশ্রুজিৎ ধীরে-ধীরে ঘাড় নাড়ল। ভাবল, কথাটা ভুল নয়। নাচ তো মনের ভাবেরই প্রকাশ। তবু, অনেকক্ষণ এই উদ্দাম নাচ-গান দেখার পর সে ব্যান্ডের ছেলেদের কাছে গিয়ে নিজের পছন্দমতো

একটা গানের ফরমায়েশ করল। সেই গান শুরু হতেই পার্টির উৎসাহীদের নাচ থেমে গেল। তারা থমকে গিয়ে ভাবল, এটা আবার কী? গানটা হিন্দি ফিল্মের গানই, অপরিচিতও নয়, কিন্তু কেমন একটা বিট, এর সঙ্গে কীভাবে নাচে? কিছুক্ষণ পরে বুঝল, ওঃ! একটু স্লো মোশনের ব্যাপার। সবাই আবার আস্তে-ধীরে গা দোলাতে শুরু করল। ইতিমধ্যে অশ্রুজিৎ রাধাকে টেনে এনেছিল নাচিয়েদের জটলার মাঝখানে। দু'জনে আরম্ভ করল ফক্স ট্রট। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবেন সিংহ এবং মিসেস সিংহও ডান্স ফ্লোরে এলেন। একটু পরে এই দুই জোড়ার দেখাদেখি আরও কয়েক জোড়া নাচ শুরু করল। বোঝা গেল, পার্টির মিশ্র ভিড়ে নাচ জানা লোকেরও অভাব নেই। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর হঠাৎ গানের দল তুলনায় দ্রুতলয়ের একটা বাজনা শুরু করল। অন্য নাচের জোড়াদের মতো রাধাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অশ্রুজিৎ তাকে বাধা দিল, চাপাস্বরে বলল, "নো প্রবলেম, ফক্স ট্রট স্লো কুইক, সব মিউজিকের সঙ্গেই যায়। একই মুভমেন্ট, শুধু একটু ফাস্ট। জাস্ট আমাকে ফলো করো।"

অন্য কাপ্‌লরা আর কেউ নতুন গানের সঙ্গে নাচ শুরু করেনি। এমনকী, দেবেন সিংহ আর সোনাল সিংহও সরে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখা গেল, বৃত্তাকার দর্শকদের মাঝখানে নৃত্যের তালে ভেসে চলেছে একটি কাপ্‌ল, রাধা আর অশ্রুজিৎ। গান থামতে তারাও নাচ থামাল। হাততালিতে ফেটে পড়ল বলরুম। দু'জনে দু'জনকে বাও করে দু'দিকে চলে গেল। রাধা গেল সোনাল সিংহের কাছে। মিসেস সিংহ তাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। অশ্রুজিৎকে কাছে ডেকে দেবেন সিংহ বললেন, "তুম বড়া ছুপা রুস্তম নিকলা, ব্রাদার!"

পার্টিতে ভোজনের আগে পানের ব্যবস্থা ছিল। শুরু থেকেই প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পান করছিলেন। অশ্রুজিৎও সামান্য করেছিল। মিসেস সিংহের ভোরাজুরিতে রাধাও একমাত্র পিঙ্ক জিন নিয়েছিল।

ফলে ডিনার টেবিলে বসে তার শরীর রীতিমতো ঝিমঝিম করছিল। দেবেন সিংহের এক বন্ধু একেবারে বেহেড না হলেও, সামান্য বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রায় জেদ করে রাধার পাশে বসলেন। রাধার তখন চোখ-কান সবই ভোঁ ভোঁ করছে। মাথাও ভাল কাজ করছে না। কে পাশে আছে আর কে দূরে, তা লক্ষ করার মতো অবস্থায় সে নেই। দেবেন সিংহ মনে-মনে একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না। হাজার হোক, বন্ধু মানুষ। তা ছাড়া ভদ্রলোক নামী সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক, তাঁকে সহসা রূঢ় কথা বলা যায় না। ভদ্রলোক রাধার পাশে বসার পর থেকেই কিছু অসভ্যতা শুরু করেছিলেন। দূরে একটি টেবিলে বসে অশ্রুজিৎ দেখল, রাধা থেকে-থেকেই মুখ-চোখ বিকৃত করে কিছু বলছে এবং তার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। মনে হল, চেয়ারে বসেই রাধা টলছে। অশ্রুজিৎ মনে-মনে নিজেকে দোষী মনে করল। রাধাকে ভালয়-ভালয় কলকাতা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। বাবাকে বড়মুখ করে বলে এসেছে, কোনও চিন্তা না করতে। তারই ভুল। রাধার পানের অভ্যেস নেই। আজ এখানে আসার আগেই তাকে ড্রিঙ্কস নিতে বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল বা মিসেস সিংহকে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল যে, তিনি রাধাকে পান করতে জোরাজুরি যেন না করেন। অশ্রুজিৎ ভাবছিল. তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে রাধাকে গেস্টহাউসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। দেবেন সিংহ ওদিকে আন্দাজ করেছিলেন ঘটনাটা আসলে কী। তিনি ভাবছিলেন কোনও ফিকিরে রাধাকে ওই লোকটার পাশ থেকে তুলে অন্য কোথাও বসাতে হবে। ভাবলেন, এই ব্যাপারে স্ত্রীর সাহায্য নেবেন। সোনাল গিয়ে রাধাকে ওখান থেকে ডেকে আনুক। স্ত্রীকে ডাকতে যাচ্ছিলেন দেবেন সিংহ, তখনই প্রচণ্ড গোলমাল শুনে ফিরে তাকালেন। রাধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টলছে। ইতিমধ্যেই সে একটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে

লোকটির গালে। এখন টলতে-টলতে জড়ানো গলায় তাকে গালি দিয়ে চলেছে, "শয়তান, বদমাশ, ইউ বাস্টার্ড," এই কথাগুলোই বারবার বলে চলেছে।

আর লোকটি চারদিকে তাকিয়ে বলছে, "হোয়া...ট, হোয়াট, হোয়াট ডিড আই ডু? আই ডিড নাথিং, নাথিং।"

অশ্রুজিৎ দৌড়ে গিয়ে রাধার হাত চেপে ধরল। আর-এক হাত কাঁধে রেখে টেনে নিয়ে এল গোলমালের জায়গাটা থেকে। ওদিকে দেবেন সিংহ তাঁর বন্ধুর ঘাড়ে হাত রেখে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন আর কোথাও। সোনাল সিংহ তখন মুখে হাসি বজায় রাখার চেষ্টা করতে-করতে অন্যাদের আশ্বস্ত করছেন, "ইটস অলরাইট...প্লিজ় ক্যারি অন।"

অশ্রুজিৎ আর দাঁড়াল না। রাধাকে সঙ্গে করে বলরুম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল গেস্টহাউসের দিকে। কিছুদূর যাওয়ার পর পিছন থেকে দ্রুতপায়ে এলেন দেবেন সিংহ। পাশে চলতে-চলতে তিনি দুঃখিত ভঙ্গিতে বললেন, "আই অ্যাম সরি সানিয়াল, আই অ্যাম সরি মিস রায়। আমি আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি বুঝতে পারিনি।"

অশ্রুজিৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এত ভাববেন না, এ এমন কিছু নয়! পার্টিটার্টিতে তো একটুআধটু হয়েই থাকে।"

"না না," দেবেন সিংহ গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, ওর নেশা কেটে গেলে আমি ওকে মিস রায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করব।"

"প্লিজ মি. সিংহ, এটা করবেন না। রাধা অলরেডি ওকে একটা চড় মেরে এসেছে। লোকটাকে আর হিউমিলিয়েট করে কাজ নেই।"

"ওয়েল, তোমাদের যদি তাই মনে হয়!" দেবেন সিংহ মনে-মনে স্বস্তি বোধ করলেন। নোংরা ঘটনাটাকে বাড়াতে তিনিও চাইছিলেন না। তাঁকেও সবদিক ভেবে চলতে হয়। একটা ঘটনার জের বাগানের

ব্যাবসার উপরে পড়ুক সেটা তিনি চান না। দেবেন সিংহ বললেন, “আমি তা হলে ফিরে যাই। বাকিরা সবাই এখনও আছে।”

“নিশ্চয়ই। আপনার ওখানে থাকা দরকার।”

দেবেন তবুও রাধাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, “আর ইউ অলরাইট মিস রায়?”

রাধা মাথা নাড়ল, “ইয়েস।”

দেবেন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। বাকি রাস্তাটা রাধা আর অশ্রুজিৎ কেউ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেনি। গেস্টহাউসের বারান্দায় উঠে রাধা হঠাৎ অশ্রুজিতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুষ্ট ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, “ঘটনাটা এমন কিছু না, মনে হচ্ছে কেন আপনার?”

অশ্রুজিৎ অবাক হয়ে বলল, “কোথায় মনে হচ্ছে?”

“এই তো মি. সিংহকে তা-ই বললেন, পার্টিতে অমন হয়ে থাকে?”

“ওঃ,” অশ্রুজিৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “উনি ওঁর বন্ধুর কাণ্ডে খুবই দুঃখ পেয়েছেন। ওঁকে আর চাপ দিতে চাইনি। তাই ওটা বললাম। আর ...” অশ্রুজিৎ একটু থেমে বলল, “তোমার আসলে পার্টিটার্টির অভিজ্ঞতা বেশি নেই। এরকম কিন্তু সত্যি হয়েই থাকে। এর চেয়ে আরও সিরিয়াস গোলমালও হয়। সেদিক থেকে এটা এমন কিছু নয়।”

“এটা যথেষ্ট সিরিয়াস ব্যাপার,” রাধা ঝেঁঝে উঠল, “আপনি নিজে মেয়ে হলে বুঝতেন, এটা কত বড় অপমান।”

অশ্রুজিৎ মাথা নাড়ল, “ঠিকই। তোমার মতো করে সত্যিই বুঝতে পারব না। কিন্তু, দ্যাখো, লোকটা একটা শাস্তিও তো পেয়েছে। সবার সামনে তোমার চড় খেল।”

“তাতে কী হল?” রাধা অধৈর্য স্বরে বলে উঠল, “তাতে আমার অপমান কি কিছু কমল? কিছু কমল না। আমি তো একটা মানুষ,

লেখাপড়া জানি, আপনাদেরই মতো আমারও যে অনেক অ্যাম্বিশন আছে, এসব চাপা পড়ে গিয়ে বড় হয়ে উঠল শুধু আমি একজন মেয়ে। আমার এই শরীরটা ছাড়া আর কিছু নেই।"

অশ্রুজিৎ বিধ্বস্ত বোধ করছিল। সে বলতে গেল, "আই অ্যাম সরি রাধা। আমি এখন বুঝতে পারছি..."

"আপনি কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না," রাধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অশ্রুজিৎ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রাধার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শেষে ক্লান্ত পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে অশ্রুজিৎ দেখল, আকাশ মেঘলা। আধোঅন্ধকার, চারপাশে ঘন কুয়াশা। আজও বৃষ্টি হবে। এখন বর্ষাকাল। আর এ হল পাহাড়ের বর্ষা। তবু এখনও বৃষ্টি নামেনি যখন, অশ্রুজিৎ ট্র্যাকসুট পরে ঘর থেকে বেরোল। বারান্দা বরাবর হেঁটে এসে দাঁড়াল রাধার ঘরের সামনে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ডাক দিল, "রাধা।"

ভিতর থেকে সাড়া নেই। অশ্রুজিৎ জানলার সামনে গেল। বন্ধ কাচের জানলার ভিতরে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পরদা টানা। অশ্রুজিৎ ডাকল, "রাধা।"

সাড়া না পেয়ে বারদুই জানলায় আঙুল ঠুকল, ঠুক ঠুক। তাতেও সাড়া না পেয়ে ভাবল, ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। অশ্রুজিৎ সিঁড়ি দিয়ে নেমে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। ক্রমশ গতি বেড়ে দৌড়ে পরিণত হল।

অশ্রুজিৎ যখন প্রথমবার ডেকেছিল তখনই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রাধার। রাতে ঘুম গভীর আসেনি একবারের জন্যও। নিদ্রা ও জাগরণের দুই সীমানার মধ্যবর্তী উপলাস্তীর্ণ মালভূমিতে নাচার মন বিচরণ করেছে সারাক্ষণ। জানলার কাছ থেকে যখন আবার ডাক এল, রাধা নিশ্চিত হয়েছিল, বাইরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে

অশ্রুজিৎ। পরদা দিয়ে আবছা বোঝা যায় তার অবয়ব। লেপের মধ্যে তলিয়ে থাকা শরীর তখন আক্রান্ত ও আড়ষ্ট। অভিমানী মন গুমরে উঠে বলল, সাড়া দেব না। কান শুনল জানলায় ঠুকঠুক শব্দ। বিষণ্ণ চোখ নীরবে চেয়ে রইল পরদায় জমে যাওয়া নতমস্তক ছায়ার দিকে। আস্তে-আস্তে ছায়া সরে গেল, মিলিয়ে গেল তারপর। বাইরে থেকে ভেসে এল ক্রমশ বিলীয়মান পদধ্বনি।

রাধা লেপ সরিয়ে খাট থেকে নামল। পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে। পরদা সামান্য সরিয়ে তাকাল বাইরে। আশপাশে কেউ নেই। যে একটু আগেও ছিল, সে এখন কুয়াশার ওপারে অন্য কোনও দেশে। রাধা ফিরে এসে তার খাটে আধশোয়া হয়ে বসল। গত রাতের কথা মনে পড়ল। শরীরে অস্বস্তি বোধ করল সে। মনে অশান্তি। লেপটা টেনে নিল বুক পর্যন্ত। অপলকে চেয়ে রইল জানলার দিকে। কখন একসময় চোখ বুজে এল।

এই যে আকাশ মেঘলা, এই যে এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে ভাব, অথচ নামার নাম নেই, এর মতো অসহ্য বিষণ্ণতা আর নেই। তার চেয়ে একটু গলে পড়লে ভাল। অশ্রুজিৎ পায়েহাঁটা পিছল পথে সাবধানে দৌড়োতে-দৌড়োতে ভাবল, আজ যেন ভাল লাগছে না। চারদিকে কেমন মনখারাপ ভাব। আরও খানিকটা ছুটে হাল ছেড়ে দিল অশ্রুজিৎ। থমকে দাঁড়িয়ে, চারপাশে ঘনিয়ে আসা কুয়াশা দেখতে-দেখতে ভাবল, যাই, ফিরেই যাই। ফেরার পথে আর ছুটল না সে। আনমনা পায়ে মেঘের মধ্যে মেঘ ঠেলে চলতে থাকল।

গেস্টহাউসের চারপাশে মাথা-ছাঁটা গাছগাছালির বেড়া। সামনের দিকে রং-করা বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল। আঃ, কী আরাম! "রাধা!" সোচ্চার গলায় ডাকল সে। বারান্দার দিকে এগোতে-এগোতে আবার ডাক দিল।

রাধা চটকা ভেঙে ফ্যালফেলিয়ে তাকাল। ঘরে অপরিস্ফুট

ভোরের আভাস। আবার কানে এল তার নাম ধরে বহুদূর থেকে ডাকছে কেউ। রাধা খাট থেকে নেমে দ্রুতপায়ে দরজার কাছে গেল। এক মুহূর্ত কান পেতে অপেক্ষা করল, আবার তাকে কেউ ডাকল। রাধা দরজা খুলে বাইরে এল। অঝোর বৃষ্টির জলে সামনেই ভিজছে অশ্রুজিৎ, হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। পাগল! রাধা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল তার। কী ভয়ংকর ঠান্ডা। শরীর কুঁকড়ে ভিজতে-ভিজতে অশ্রুজিতের দিকে এগিয়ে গেল সে। অশ্রুজিৎ তার হাত ধরে কাছে টেনে বলল, "কাল ভিয়েনিজ় ওয়লজ় শিখতে চেয়েছিলে? এসো!"

অশ্রুজিতের চোখে নেশা-লাগা রং, মাদকতাময় আমন্ত্রণ। সেদিকে তাকিয়ে অবশ হয়ে যেতে-যেতে রাধা অস্ফুটে বলল, "তুমি কী! এই ঠান্ডায় বৃষ্টিতে?"

"এসো! এক-দুই-তিন পাশে, এবার চার..." রাধার হাত তার মাথার উপরে তুলে ঘূর্ণির পাকে ঘুরিয়ে দিল অশ্রুজিৎ, "এক-দুই-তিন সামনে, এবার চার..."

অশ্রুজিৎ রাধার পিঠে বাঁ হাত রেখে তার বাম জঙ্ঘা ডান হাতে জড়িয়ে নিজের দুই পায়ের ফাঁকে তাকে গলিয়ে দিয়ে পলকে ফের টেনে তুলল।

"উঃ!"

অশ্রুজিৎ অতি যত্নে রাধাকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যথা পেলে?"

রাধা অশ্রুজিতের বুকে মাথা রেখে তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, "না।"

"তা হলে চলো আবার।"

"চলো।"

কুয়াশাঘেরা বৃত্তের মধ্যে বৃষ্টির জলে ভিজতে-ভিজতে নেচে চলল দু'জনে। রাধা একবার বলল, "ওরা দেখছে আমাদের।"

"কে দেখছে?"

অশ্রুজিতের বক্ষলগ্না রাধা আঙুল তুলে দেখাল, "ওই যে!"

বৃষ্টি আর কুয়াশা ভেদ করে দেখা গেল, গেস্টহাউসের বারান্দায় গুটিকয় অস্পষ্ট অবয়ব। গেস্টহাউসের কর্মীরা। মনে হল গেস্টহাউসের পাশে একটু দূরে দেবেন সিংহের কোয়ার্টারের বারান্দাতেও জনাদুই দর্শক এসে দাঁড়িয়েছে।

"দেখুক!"

মিনিট পাঁচেক পরে দুই কাকভেজা মূর্তি উঠে এল বারান্দায়। একটু পরে পেল্লায় ছাতা মাথায় সেখানে হাজির হলেন সস্ত্রীক দেবেন সিংহ। অশ্রুজিৎ ও রাধা তখন আলোচনা করছে তাদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার প্রবাবিলিটি কতটা। আদৌ হতে পারে কি?

"তোমরা দু'জন আচ্ছা পাগল তো! পাহাড়ের এই বৃষ্টিতে ভিজলে?" দেবেন সিংহ সশব্দে হাসতে-হাসতে বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে তেমন উদ্বেগ প্রকাশ পেল না।

সোনাল সিংহ বরং বিন্দুমাত্র ভর্ৎসনা না করেও তাড়া দিলেন, "এভাবে ভিজে-পোশাকে আর দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও, গা-মাথা মুছে এক্ষুনি চেঞ্জ করে নাও।"

স্বামীর দিকে ঘুরে বললেন, "দেবেন, চলো আমরা ডাইনিং রুমে বসি। ওরা চেঞ্জ করে এলে আমরা একসঙ্গে চা খাব।"

কিছুক্ষণ পর অশ্রুজিৎ ও রাধা ডাইনিং রুমে এসে দেখল, সিংহদম্পতি টেবিলে প্রাতরাশ ও টি-পট সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাদের দু'জনের জন্য নির্দিষ্ট পাশাপাশি দুটো চেয়ারের চারপাশে গোটাচারেক রুমহিটার ও ব্লোয়ার চলছে। সোনাল বললেন, "তোমরা চাইলে হিটারের উপর পা তুলে বসতে পারো, আরাম লাগবে।"

আরাম লাগছিল। বর্ষায় পাহাড়ের ঠান্ডাটা উপেক্ষা করার বস্তু

নয়, তা কিছুক্ষণ আগে থেকে মালুম হতে শুরু করেছে। তবে আগুনের সামনে, পাশে আগুন নিয়ে বসলে এসব চিন্তা আর মাথায় থাকে না।

বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা চলল। দেবেন রসিক মানুষ। অশ্রুজিতের সঙ্গে জমিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি করলেন। ওদিকে সোনাল রাধার সঙ্গে নিচু গলায় মাঝে-মাঝে কী আলোচনা করছিলেন, এঁরা দু'জন সবটা শুনতে পেলেন না। মনে হল, রাধার ঘর-পরিবার, লেখাপড়া, এসব নিয়ে কথা হচ্ছে। আড্ডার শেষে সোনাল বললেন, "আজ আমাদের বাড়িতে তোমরা ডিনার করবে। সকাল-সকাল চলে এসো," রাধার দিকে ঘুরে বললেন, "অ্যান্ড ডোন্ট ওরি, আজ আমরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না।"

এমন জাদুর রাত প্রতিটি দিনের শেষে পৃথিবীতে নেমে আসে না। বিরল এই সম্মোহনেই হয়তো, সিংহদম্পতির বাড়ি থেকে ডিনার সেরে ফেরার পথে দু'জনেই বড় চুপচাপ ছিল। পাশাপাশি হাঁটছিল দু'জন, যেন একজন হয়ে। অথচ দূরত্ব ছিল। পাগলকরা আধ হাতের ব্যবধান। নিজেরই দুই সত্তার মধ্যে এই দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার অদম্য কামনায় ভিতরে-ভিতরে তোলপাড় হচ্ছিল তারা। বাইরে ছিল ঝড়ের আগের থমথমে ভাব। গেস্টহাউসের সামনে এসে রাধা মনে-মনে বলল, না, আজ নয়। এখনও আমি তৈরি নই। আজ সকাল থেকে ভরে আছে আমার মন। এই মন নিয়ে আজ ঘুমোতে যাব। আমাকে আরও চাও, আরও, আরও. . তারপর...

অশ্রুজিৎ এগিয়ে এসে বুকে টানল রাধাকে। মুখে কোনও কথা নেই। রাধা অশ্রুজিতের বুকে মুখ গুঁজে ভুলে গেল মুহূর্ত-আগে কী ভেবেছিল। মনে করিয়ে দিল অশ্রুজিৎ। কানে-কানে ফিসফিসিয়ে বলল, "গুডনাইট!"

রাধা মুখ তুলে অবাক চোখে তাকাল। অশ্রুজিৎ আলিঙ্গন খুলে

মাতাল চোখে দেখল তাকে। আবারও বলল, "গুডনাইট!" তারপর ঘুরে আধো অন্ধকার বারান্দায় পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল তার ঘরের দিকে। রাধা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দেখল তাকে। তারপর হঠাৎ দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তাতে হেলান দিয়ে পাগলের মতো হাঁপাতে শুরু করল।

আজ ভোরের ফ্লাইট। আজও ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বাইরেটা আজ উনিশ দিন পরেও একই রকম। অথচ ভিতরে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সেদিনও অশ্রুজিৎ সঙ্গে ছিল, তবুও আমি ছিলাম একা। আজ সে আমার সঙ্গে আছে, আমি আর একা নই। এখন আমরা দু'জন। আমরা একটা কাপ্‌ল। বিমানে অশ্রুজিতের গা ঘেঁষে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে ভাবছিল রাধা, সুমচু থেকে প্রেম নিয়ে ফিরছি আমি। ও-ও কি আমারই মতো মগ্ন? রাধা ঘুরে তাকাল। অশ্রুজিৎ ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে তাকাল। আচমকা রাধাকে জড়িয়ে ধরে নিবিড় চুমু খেল একটা। মুহূর্ত পরে বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে রাধা বলল, "ইস, সবাই দেখল!"

"কে?" অশ্রুজিৎ চারপাশে তাকাল। সামনের ও পিছনের সিটের লোকেরা দেখেছে বলে মনে হল না। সামনে-দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এয়ারহোস্টেসের চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখে চাপা হাসি। ও দেখে থাকতে পারে। তো, সে ওর সৌভাগ্য!

অফিসে অশ্রুজিতের ব্যবহারে তেমন পরিবর্তন নেই। তার সব প্রেম অফিসের বাইরে। অবশ্য আজকাল প্রায়দিনই রাধার সঙ্গে অফিস থেকে বেরোয়। ওদিকে মাসকয়েক পরেই রাধার বি কম ফাইনাল পরীক্ষা। তার প্রায় পিঠে-পিঠেই চার্টার্ড আর কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ ফাইনাল। পড়ার চাপ ভীষণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে বসে প্রেম করার উপায় নেই। বেশিরভাগ দিনই অশ্রুজিৎ

তাকে অফিস থেকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। প্রেমের সময় ওইটুকুই। অফিস থেকে বাড়ির পথে গাড়িতে। দুর্লভ এক-আধটা দিনে এক-দেড়ঘণ্টা আরও চুরি করে কোথাও বসে ওরা। অশ্রুজিৎ কখনও তাকে ক্লাবে নিয়ে যায়, কখনও রেস্তরাঁয়। কয়েকবার বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছে। প্রতিবারই মধুরা কৌতূহলী হয়ে আলাপ করেছেন রাধার সঙ্গে। তিনি ইতিমধ্যেই স্বামীর কাছে শুনেছিলেন, "ওদের মধ্যে কিছু একটা ডেভেলপ করেছে মনে হচ্ছে। অশ্রু ইজ় ফাইনালি বিকামিং আ ম্যান।"

মধুরা বুঝেছিলেন রাধা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে। সান্যাল পরিবারে এ পর্যন্ত যারা বউ হয়ে এসেছে, ঠিক তাদের মতো ব্যাকগ্রাউন্ড ওর নয়। তবু মেয়েটিকে অপছন্দ হয়নি তাঁর। অশ্রুজিতের বাড়ির গ্যারাজে নতুন গাড়ির পাশাপাশি পুরনো একটা গাড়ি দেখে অবাক হয়েছিল রাধা। বোঝা যায়, বহুকাল আগের মডেল। কিন্তু একেবারে নতুনের মতো ঝকঝক করছে। সাধারণ কৌতূহল থেকে রাধা গাড়িটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, "কী গাড়ি এটা?"

"এটা একটা দুর্লভ গাড়ি," বলতে-বলতে অশ্রুজিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

রাধা বুঝেছিল, এটা শুধু গাড়ি নয়, এ অশ্রুজিতের আর-এক প্রেম। যন্ত্রটার জন্য একরাশ ভালবাসা জমা হয়ে আছে ওর মনে। একটু নাড়া দিলেই হয়তো ভিতরের আবেগ চুঁইয়ে বাইরে আসবে। রাধা জিজ্ঞেস করেছিল, "কবেকার গাড়ি?"

তার ধারণা ভুল ছিল না। অশ্রুজিৎ বাঁ হাতে গাড়ির বনেটে আদরের হাত বুলোতে-বুলোতে ডান হাতে রাধাকে বুকের কাছে টেনে এনে জবাব দিয়েছিল, "নাইনটিন থার্টি-ওয়ানের মেক। স্মিথ-সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানির এককালের সিনিয়র পার্টনার জোনাথান স্মিথ এই গাড়ির মালিক ছিলেন। আমার ঠাকুরদার বাবা শিবপ্রসাদ সান্যাল গাড়িটা ওঁর কাছ থেকে কিনে নেন।"

"উনিশশো একত্রিশ! আমার বাবাও তখন জন্মাননি।" অশ্রুজিতের বুকে তার ভালবাসায় বিভোর রাধা স্বপ্নাতুর চোখে বলে উঠল।

"আমার বাবাও না। এই গাড়িটা বাবার চেয়ে বয়সে বারো বছরের বড়। বাবার বড়দা বলা যেতে পারে।"

রাধা খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলল, "তোমার জেঠু!"

"ঠিক। খুব আদরের জেঠু।"

"সেকেলে হলেও এখনও বেশ ইয়ং দেখতে, বেশ অ্যাট্রাকটিভ!"

"রসেবশে রাখতে হয়। রীতিমতো খিদমত করতে হয়। জেঠু ভেরি ডিম্যান্ডিং। সেই আমলের লোক তো।" অশ্রুজিৎ মুচকি হেসে স্টেপনির টায়ারের একপাশ আলতো করে টিপল, যেন মেজাজিবাবুর পা টিপে দিচ্ছে।

"কে করে খিদমত, তুমি?"

"সন্দেহ আছে? কেন, আমি কি খিদমতগার হিসেবে খারাপ?" অশ্রুজিতের হাত বিপজ্জনকভাবে রাধার বুকের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।

"উঃ!" শরীরে আগুন জ্বলে উঠছে বুঝে অশ্রুজিতের বাঁধন ছাড়িয়ে সরে এল রাধা। বলল, "কী প্রশ্নের কী জবাব! আমি কি বুড়ি যে, আলাদা করে খিদমত করতে হবে? আমি ওই বুড়োটার কথা জানতে চাইছি। এত পুরনো যন্ত্রপাতি সব তুমি নিজে সারাতে পারো?"

অশ্রুজিৎ অলস ভঙ্গিতে আবার রাধাকে ধরতে গেল, নাগাল পেল না। বেজার হয়ে জবাব দিল, "গত সাত-আট বছর বাইরের কোনও মেকানিক ওতে হাত দেয়নি। রঙের কাজও নিজেই করি," একটু থমকে বলল, "এই শহরে এমন গাড়ি কমই আছে, যা আমি সারাতে পারি না।"

"বাব্বা! এত গর্ব?"

"ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিয়ো। অন্যদের কত সেকেলে গাড়ির আমি রিপেয়ারিং আর রেস্টোরেশনে হেল্প করেছি।"

"থাক। আমি বিশ্বাস করছি," বিশ্বাস রাধা শুরুতেই করেছিল। সুমচু চা-বাগানে যখন সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল. তখন দেবেন সিংহের গাড়ি অশ্রুজিৎ কীভাবে সারিয়েছিল তা নিজের চোখে দেখা আছে তার। অবশ্য সেটা সেকেলে গাড়ি ছিল না।

"কীভাবে বুঝব কতটা বিশ্বাস করছ?" অশ্রুজিৎ রাধার দিকে এগোল।

রাধা পিছোতে-পিছোতে বলে উঠল, "অ্যাই, এখন ওসব একদম নয়, মাসিমা দোতলার বারান্দায় আছেন। গেটের দরোয়ানেরও গলার আওয়াজ পাচ্ছি। একদম না!"

শীতের সময় ভিনটেজ কার র‍্যালি হবে। অশ্রুজিৎ তাদের পরিবারের আদ্যিকালের গাড়ি নিয়ে তাতে যোগ দেবে। রাধাকে বলল. "তুমি সেদিন আমার সঙ্গে থাকবে, কো-ড্রাইভার অ্যান্ড হেল্পার।"

"কী কাণ্ড!" রাধা অবাক হয়ে বলল, "গাড়ির কাজ তো দূরের কথা, আমি তো গাড়ি চালাতেই জানি না।"

"দরকার নেই। শুধু আমার সঙ্গে থাকবে। গাড়ি চালানো কোনও ব্যাপার নয়। শিখবে?"

"কখন শিখব? সময়ই তো নেই।"

"ক'দিন সকালবেলা কলেজে প্রথম দিকের দু'-তিনটে ক্লাস বাঙ্ক করলেই সময় বেরিয়ে আসবে।"

"ক'দিন লাগবে?"

"বড়জোর সাতদিন।"

অশ্রুজিতের তত্ত্বাবধানে রাধা দিনসাতেকের মধ্যে মোটামুটি গাড়ি চালাতে শিখে গেল। কিছুদিন পরে ড্রাইভিং লাইসেন্সও

পেল। কার র‍্যালির দিন ইস্টার্ন কমান্ড স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনেক বিচিত্র গড়নের সেকেলে গাড়ি দেখল রাধা। র‍্যালি শুরু হওয়ার পর কলকাতার চেনা রাস্তায় বাস, ট্রাম, প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সির পাশাপাশি চলন্ত উনিশশো একত্রিশ-এর সেই প্রাচীন গাড়িতে অশ্রুজিতের পাশে বসে রাধার মনে রোমাঞ্চ জাগল। রবিবারের সকাল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। তবু রাস্তার দু'পাশের পথচলতি মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ছে তাদের দেখতে, হাত নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে। অন্যান্য গাড়ির আরোহীরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চার চাকার অ্যান্টিককে একঝলক দেখে নিতে চাইছে।

বি কম পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রচুর নম্বর পাবে রাধা, স্ট্যান্ড তো করবেই। মাসখানেক পরে তার আর্টিক্‌লশিপ শেষ হয়ে যাবে। চার্টার্ড এবং সি স পরীক্ষা ক'মাস পরে। তাতেও র‍্যাঙ্ক পাবে, তাও জানা। ইতিমধ্যেই কয়েকটা নামী সংস্থার অফার পেয়েছে। সেগুলো থেকে বেছে একটার অফার পছন্দ হয়েছে তার। কোম্পানিকে জানিয়ে দিয়েছে, সি এ এবং সি এস কমপ্লিট করেই সে চাকরিতে জয়েন করবে। শুধু একটা ব্যাপারেই একটু খচখচ করছে। চাকরিটা কলকাতায় নয়, বেঙ্গালুরুতে। পরে কোনওদিন হয়তো কলকাতা আসতে পারবে, কিন্তু এখন বেঙ্গালুরুর অফিসেই জয়েন করতে হবে। টাকাপয়সা, কোম্পানির নামডাক, উন্নতির সম্ভাবনা, সবদিক দিয়ে এই অফারটাই সবচেয়ে ভাল। অশ্রুজিৎও বলেছিল, "চাকরি করে কেরিয়ারই যদি বানাতে চাও, তা হলে আপাতত কলকাতার বাইরে যাওয়াই ভাল, সেক্ষেত্রে টেক দিস অফার। আর তা না হলে, আমাদের ফার্মে জয়েন করো। মাল্টিন্যাশনালের মতো অত আমরা এখনই দিতে পারব না, তবে খুব খারাপও কিছু দেব না। আর ভবিষ্যতে এই ফার্ম তো তোমারও।"

হয়তো তাই। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কেরিয়ারের

ভিতটা আমি সম্পূর্ণ নিজের জোরেই তৈরি করতে চাই। রাধা রায় যেদিন কর্পোরেট জগতে নিজের জায়গা তৈরি করতে পারবে, যখন তাকে অনেকেই অনেক দাম দিয়ে চাইবে, তখন আমি স্মিথ-সান্যালে ফিরে আসব। তোমার বউ বলে নয়, ফার্মের একজন যোগ্য পার্টনার হিসেবে। আত্মীয়-বন্ধুদের থেকে দূরে থেকে কয়েক বছর একা জীবন আর জীবিকা সামলানোর অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে নিজের উপর কনফিডেন্সটাও বাড়বে আমার। মনে-মনে ভাবল রাধা। মুখে বলল, "না। কলকাতার বাইরের বিজ়নেস ওয়ার্ল্ডটা একবার দেখে নিতে চাই। তুমি কী বলো?"

অশ্রুজিৎ হাসল। মনে-মনে ভাবল, আমাদের ফার্মে থেকে গেলে খুব অসুবিধে হত না। তুমি নিজেই জানো. কলকাতার বাইরে আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে। কিন্তু তোমার আত্মসম্মানে বাধছে। তা ছাড়া, তুমি নিজের কাছে নিজেকে যাচাই করে নিতে চাও। তোমাকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে আমার উপায় নেই। আই লাভ ইউ রাধা। আই উইল মিস ইউ। রাধার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে, সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "তোমার পয়েন্টটাই ঠিক।"

আর্টিক্‌লশিপ শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন কী একটা শূন্যতা নেমে এল জীবনে। আপাতত কিছুদিন আর অফিস যাওয়া নেই। প্রতিদিন অশ্রুজিতের সঙ্গে দেখা হওয়া নেই। দিন থেকে দিন যত এগিয়ে যেতে থাকল, চার্টার্ডের পরীক্ষার দিন যত ঘনিয়ে এল, ততই অস্থির হয়ে উঠল রাধা। অশ্রুজিৎকে দিনে পঞ্চাশবার ফোন করতে থাকল। অশ্রুজিৎ একদিন বলে ফেলল, "রাধা, এরকম করলে চার্টার্ডে তোমাব র‍্যাঙ্ক হবে না। কয়েকটা দিন আমাকে ভুলে যাও, জাস্ট কনসেনট্রেট অন ইয়োর স্টাডিজ।"

"আমি পারছি না অশ্রু!" ব্যাকুল হয়ে বলল রাধা। ভাবল, জানি এভাবে চললে পরীক্ষা বিশ্রী হবে। পড়াশোনায় একেবারেই

মন বসছে না আমার। যা এতদিন শিখেছি তা-ও যেন ভুলে যাচ্ছি। আমার কনফিডেন্স লেভেল এখন ভীষণ লো। কী করব? আমার যে শুধুই মনে হচ্ছে, চার্টার্ড শেষ হলেই আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাব। তোমাকে না দেখে দিনের পর-দিন আমি থাকব কীভাবে, অশ্রু? তোমার কাছ থেকে দূরে গেলে যদি তুমিও চলে যাও কোনওদিন? এমন কোরো না অশ্রু! আমার জন্যে প্রতীক্ষা করবে তো?

এভাবে হবে না। পরীক্ষায় ভরাডুবি হবে। কিছু একটা করতে হবে। সামনে একটাই রাস্তা! রাধা অশ্রুজিৎকে ডেকে বলল, "চলো আমরা বিয়ে করি।"

"এখন?" আকাশ থেকে পড়ল অশ্রুজিৎ। "সামনে তোমার পরীক্ষা। বিয়ে কি তিন তুড়িতে হয়? হট্টগোলের মধ্যে তোমার পড়া চৌপাট হয়ে যাবে।"

"না, ওই উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা বলছি না। সে নয় পরে হবে। আমি রেজিস্ট্রির কথা বলছি!"

"ও!" অশ্রুজিৎ গম্ভীর হয়ে গেল, কী যেন চিন্তা করছে। বুক কেঁপে উঠল রাধার। পরেই যেন তাকে আশ্বস্ত করতে মুখে হাসি এনে অশ্রুজিৎ বলল, "সে তো করাই যায়। ঠিক আছে, নেক্সট মান্থে রেজিস্ট্রি করে নেব।"

"নেক্সট মান্থ কেন?" রাধা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল।

"স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে করতে গেলে একমাস আগে তার নোটিশ দিতে হয়, সোনা!" অশ্রুজিৎ বোঝাল।

"একমাস!"

"ওরকমই নিয়ম। তার মধ্যে বিয়ে করা চলে না।"

"কিছু একটা করা যায় না? এই একটা মাস আমি বাড়িতে থাকব কী করে। পড়ায় মনই তো বসবেই না। আমি শান্তি চাইছি অশ্রুজিৎ। সেটুকু আমায় দিতে পারো না? নিয়ম যেমন আছে, তার ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে। একটু খোঁজ নিয়ে দ্যাখো না, প্লিজ।"

রাধার ছলছলে চোখের দিকে চেয়ে অশ্রুজিৎ তাকে আরও কাছে টেনে এনে বলল, "দেখব, নিশ্চয়ই দেখব রাধা। কাল-পরশুর মধ্যেই তোমায় সব জানাব।"

চার্টার্ড ফার্মের কারবারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তেমনই একটা সূত্র ধরে অশ্রুজিৎ ব্যবস্থা করে ফেলল। সপ্তাহখানেক পরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল।

"বাড়ি যাবে?" গাড়িতে বসে জিজ্ঞেস করল অশ্রুজিৎ।

"হ্যাঁ," স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে পাশে এলিয়ে বসে জবাব দিল রাধা, "ভীষণ, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। জানো, আজ বাড়ি ফিরেই ঘুমোতে যাব। মনে হচ্ছে কতদিন ভাল করে ঘুমোইনি। এখন টানা অন্তত দুটো দিন আমি শুধু ঘুমোব।"

"তারপর?"

"তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়ব। মাসদুয়েক আমি কিচ্ছু পড়িনি। সেসব মেকআপ করতে হবে। হাতে মাত্র একটা মাস। কী হবে কে জানে!"

"সব কিছু ভালই হবে," গাড়ি স্টার্ট করে বউকে একঝলক দেখে নিয়ে অশ্রুজিৎ বলল, "লিখে নাও, পরীক্ষায় তুমি টপ করবে।"

"সত্যি!" রাধা সোজা হয়ে অশ্রুজিতের দিকে ঘুরে বসল, "তুমি উইশ করছ?"

"করছি।" গিয়ার বদলে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে অশ্রুজিৎ বলল, "শুধু কি আজ, কবে থেকে করেই চলেছি।"

অশ্রুজিতের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল রাধা।

সন্দীপ বলেছিলেন রাধাকে তিনি বেঙ্গালুরু পৌঁছে দেবেন। অপালাও তাই চেয়েছিলেন। হাজার হোক, মেয়ে প্রথম কলকাতার বাইরে চাকরি করতে যাচ্ছে। রাধা সেই প্রস্তাব এককথায় নাকচ করে দিল,

"আমি কি এখনও সাবালিকা নই? তোমাদের আসার দরকার নেই। আমি ওখানে একটু গুছিয়ে নিই, তারপর তোমরা দু'জনেই আমার কাছে গিয়ে ক'দিন থাকবে।"

অপালা গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ে বলেছিলেন, "একেবারে একা যাবি?"

সন্দীপ কিছু বলেননি। তিনি মেয়েকে দেখতে-দেখতে ভেবেছিলেন, সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা! কবে তুই এতটা বড় হয়ে গেলি রাধা, কিছু বুঝতেই পারলাম না! বলেছিলেন, "নিয়মিত ফোন করিস। পৌঁছেই খবর দিবি কিন্তু!"

বাবাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরও কারণ ছিল, অশ্রুজিৎ সঙ্গে যাচ্ছে। অশ্রুজিৎ অবশ্য বলেছিল, "বাড়িতে বলে দাও আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তা হলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।"

"না।" রাধা চিন্তিত মুখে বলেছিল, "বাবা জানতে পারলে ভীষণ দুঃখ পাবেন। বাবাকে না জানিয়ে কোনওদিন কোনও কাজ করিনি।"

"কিন্তু, আজ হোক, কাল হোক, জানাতে তো হবেই।"

"হবে, অন্যভাবে," রাধা অশ্রুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "তোমাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রস্তাব দেওয়া হোক। বাবা আমার মত জানতে চাইবেন, আমি হ্যাঁ বলব। তখন অনুষ্ঠান করে আমাদের বিয়ে হবে।"

"ওঃ! এই ব্যাপার? আমি আজই বাবাকে বলছি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে।"

"না না। এখন নয়। অনুষ্ঠান করে বিয়ের অনেক হ্যাপা।" রাধা মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেছিল, "চাকরিতে সবে জয়েন করব। এখনই ওসব ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না। ক'মাস পরে।"

"সেটাও ঠিক," অশ্রুজিৎ সায় দিয়েছিল।

এয়ারপোর্টে আলাদাভাবে সিকিয়োরিটি চেক ইন করেছিল দু'জনে। অশ্রুজিৎকে কেউ সি-অফ করতে আসেনি। সে আগে ভিতরে ঢুকেছিল। রাধাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তার বাবা-মা। সন্দীপ অনেক কষ্টে চোখের জল ধরে রেখেছিলেন। অপালা পারেননি। রাধাও না। মা-বাবার কাছে বিদায় নেওয়ার আগে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। প্লেনে উঠে অশ্রুজিতের পাশে বসেও সে ছলছল চোখে চেয়ে ছিল জানলা দিয়ে বাইরে। "বাড়ির জন্য মনখারাপ করছে?" জানতে চেয়েছিল অশ্রুজিৎ।

নীরবে মাথা নেড়েছিল রাধা।

একটু ইতস্তত করে অশ্রুজিৎ বলেছিল, "চাইলে তুমি এখানেই আমাদের ফার্মে... আমি তো তোমাকে বলেছিলাম!"

রাধা রুমালে চোখ মুছে জবাব দিয়েছিল, "জানি। কিন্তু, না।" জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল এয়ারহোস্টেসের দিকে। নির্দেশমতো সিটবেল্ট বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বেঙ্গালুরুতে অশ্রুজিতের পরিচিত মানুষজন আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে আগে থেকে রাধার জন্য ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সে। সকালে বেঙ্গালুরু হ্যাল এয়ারপোর্টে অশ্রুজিতের বন্ধু সুদীপ গাড়ি নিয়ে এসেছিল ওদের রিসিভ করতে। ফ্ল্যাটে পৌঁছে একটু ফ্রেশ হয়ে একসঙ্গে বেরোল ওরা। রেস্তরাঁয় খাওয়া সেরে রাধাকে নতুন অফিসে পৌঁছে দিয়ে অশ্রুজিৎ সুদীপের সঙ্গে বাজারে গেল।

নতুন ফ্ল্যাটে রাধার সংসারে খাট-বিছানা, ফ্রিজ, ফ্যান থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছুই লাগবে। প্রচুর শপিং করা হল।

একজন ইলেকট্রিশিয়ান এবং দোকান থেকে জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে আসা লোকের সহায়তায় সন্ধে নামার আগে দু'বন্ধু ফ্ল্যাটটা মোটামুটি গোছগাছ করে ফেলল। চারদিকে তাকিয়ে অশ্রুজিৎ খুশি হয়ে বলল, "গ্র্যান্ড সাজিয়েছি কিন্তু! রাধার তাক লেগে যাবে।"

"যা বলেছিস!" সুদীপ তাল দিয়ে বলল।

সেলিব্রেশনের জন্য ফ্রিজ, ফ্যানের সঙ্গেই এক বোতল তরলও আনা হয়েছিল। দু'জনে তাই এক-এক গ্লাস পান করে ফেলল। রাধাও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরল। দু'বন্ধু লাফিয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে তার মতামত জানতে চাইল, "কী, কেমন সাজিয়েছি?"

"থ্যাঙ্কস, প্রচুর পরিশ্রম করেছ," হাসিমুখে বলল রাধা।

অশ্রুজিৎ আর সুদীপ পরস্পরের দিকে চেয়ে গর্বের হাসি হাসল।

রাধা বলল, "কিন্তু, বড্ড এলোমেলো সাজিয়েছ। ফ্রিজ কি এখানে থাকে নাকি? ওটা থাকবে আর-একটু পাশে, আর-একটু আড়ালে। আর পরদার রংটা ঠিক হয়নি, ওটা চেঞ্জ করতে হবে। তা ছাড়া সোফা আর খাটটাও..."

দু'বন্ধু প্রবল হতাশায় মুখ কালো করে চুপসে বসে পড়ল। রাধা হেসে বলল, "আজই এত তাড়াহুড়ো করে সব কিনে আনার কী দরকার ছিল? যাক গে, কাল অফিস থেকে কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে আমি সঙ্গে যাব। জিনিসগুলো চেঞ্জ করে কোনটা কী নিতে হবে দেখিয়ে দেব।"

আরও একপাত্র পান করে সুদীপ বিদায় নিল। অশ্রুজিৎ আর রাধা তাকে অনুরোধ করল রেস্তরাঁয় রাতের খাওয়া সেরে যেতে।

"পাগল!" সুদীপ সোফা থেকে উঠতে-উঠতে বলল।

সুদীপ চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে তাতে হেলান দিয়ে রাধার দিকে চেয়ে রইল অশ্রুজিৎ। রাধাও চেয়ে আছে। দু'জনের চোখে দু'জনের কামনার নীরব স্বীকৃতি। স্তব্ধ চারপাশ। দুটি মানুষের মধ্যে ফাঁকা জায়গা আবেগে ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে। দেখা না গেলেও তাকে স্পর্শ করা যায়। আগেও তো কতবার হয়েছে এই স্পর্শের অনুভূতি। কতবার! তবু এই ব্যবধান! আচ্ছন্ন অশ্রুজিৎ রাধার

দিকে এগোতে-এগোতে অস্ফুটে বলল, "মিঞা-বিবি একসঙ্গে অবশেষে..."

আজ বাধা দিল না রাধা। অশ্রুজিতের বাহুতে বন্দি হয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "উঃ!"

হঠাৎ চটকা ভাঙল অশ্রুজিতের। ঘর প্রায় অন্ধকার। আবছা আলোয় আবিষ্কার করল রাধা অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার বুকের উপর উপুড় হয়ে। কারও শরীরেই সুতোটিও নেই। হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে ঘড়িটা তুলে চোখের কাছে এনে সময় দেখল অশ্রুজিৎ। রাত দশটা। ঘড়িটা নামিয়ে রেখে রাধাকে মৃদুস্বরে ডেকে আলতো নাড়া দিল সে।

"উমম, কী?" রাধা ঘুমের ঘোরে জানতে চাইল।

"দশটা বাজে। খাবে না?"

"না।"

"তাই কি হয়! মাঝরাতে খিদে পেয়ে যাবে।"

"উঁউ।"

"চলো, খেয়ে আসি।"

"আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।"

অশ্রুজিৎ কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, "আমি তা হলে বাইরে গিয়ে কিছু কিনে আনি?"

"হুঁ," শুয়ে-শুয়েই মাথা দোলাল রাধা। আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

অশ্রুজিৎ মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে একটু নেমে শোও।"

"কোথায়?"

"এই, আমার পাশে বিছানায়।"

"কেন?"

অশ্রুজিৎ মাথা চুলকে বলল, "নইলে আমি উঠে বাইরে যাব কীভাবে?"

"উউউ...," বিচিত্র রবে প্রতিবাদ করতে-করতে রাধা অশ্রুজিতের বুক থেকে গড়িয়ে নামল। ঘুমও বোধ হয় ভাঙল তার। চোখ খুলে নিজেকে এবং সঙ্গীকে জন্মের অবস্থায় দেখে হাত বাড়িয়ে বিছানার চাদরটাই টেনে গা ঢাকতে চেষ্টা করল সে। তা দেখে অশ্রুজিৎও চট করে মেঝেয় পড়ে থাকা প্যান্টটা গলিয়ে নিল।

পরের দু'দিন রাধাকে সঙ্গে করে নতুন কেনাকাটা ও কিনে ফেলা জিনিসপত্র অদলবদল করা হল। খাটটা অবশ্য রাধা শেষপর্যন্ত বদলাল না।

বেঙ্গালুরুতে ঘর গুছিয়ে অশ্রুজিৎ কলকাতা ফিরে এল। সেই লেজার, সেই জার্নাল, সেই অডিট, সেই অ্যাকাউন্টসের জট। ডেবিট-ক্রেডিটের পাল্লা সমান করার খেলা। খেলা চলতে থাকে যেমন চলেছে বরাবর। তবু খেলোয়াড়ের আজ মনে হল, ব্যালান্স শুধু খাতায়, শুধু বাইরে। ভিতরের ব্যালান্সশিট কখনও মেলানো যায় না। প্রাপ্তির সুখের চেয়ে বেশি যেন হারিয়ে ফেলার ভয়, সুখেরই মতো এক অসুখ। জীবন কোথাও বদলে গিয়েছে। আশ্চর্য এই যে, ডেবিট-ক্রেডিটের পরোয়া না করেই।

"তোকে ক'দিন কেমন ক্লান্ত আনমনা দেখাচ্ছে, অশ্রু! ক'টা দিন ছুটি নে," সন্ধেয় অফিস থেকে বেরোনোর মুখে ছেলের চেম্বারে উঁকি দিলেন গগন।

অশ্রুজিৎ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাবার মুখের দিকে। ভিতর কি এতটাই ছাপ ফেলেছে বাইরে?

"যন্ত্রের মতো কাজ করিস তুই। মানুষ তো যন্ত্র নয়!" ধীরে-ধীরে মাথা দোলালেন গগন।

না, মানুষ যন্ত্র নয়! জানলার দিকে তাকাল অশ্রুজিৎ।

"ছুটি নে। এনজয় লাইফ। ডিস্কোথেকে যা, নাইট ক্লাবে যা। পিক-আপ আ ফিউ গার্লফ্রেন্ডস। তোর বয়সি আর পাঁচটা ছেলে যা করে!"

অশ্রুজিৎ হেসে ফেলল। শান্ত স্বরে বলল, "আচ্ছা, তোমার কথা ভেবে দেখব।"

গগন একটু বিরক্ত হলেন। কমবয়সিদের বুড়োটে হাবভাব তাঁর একেবারে সয় না। তিনি ভাবটা চেপে রেখে বললেন, "যৌবন কারও চিরকাল থাকে না, অশ্রু। পরে আফশোস করলেও সে আর ফিরবে না। যা ভাল বুঝিস কর।"

গগন বোঝেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। লাইফ ইজ শর্ট। আজই রাতের ফ্লাইটে তিনি দিল্লি যাবেন। আগামীকাল পরপর অনেক মিটিং সেখানে। তবু এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে সময় বের করে একবার ক্লাবে ঘুরে যাবেন তিনি। জীবন এরকমই।

প্রতিবারই বেঙ্গালুরু গিয়ে বোঝা যায় অফিসে রাধার দায়িত্ব ও ব্যস্ততা বেড়েছে। অনেক সময় ছুটির দিনেও তাকে অফিস যেতে হয়। এমনকী, অশ্রুজিৎ সেসময় বেঙ্গালুরুতে থাকলেও যেতে হয়। ফিরে এসেও গল্প-কথা তেমন হয় না। বোঝা যায় ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চায়। হয়তো মনও। মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে অফিস, ফাইলবন্দি হয়ে বাড়িতেও পিছু ধাওয়া করে। তখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে প্রেম, অস্বস্তিকর যৌনতা। অশ্রুজিৎ দাবি জানালে রাধা জবাব দেয়, "কলকাতায় তোমার দিন কীভাবে কাটে, অশ্রু? আমার জন্য ক'দিন অফিস ফাঁকি দিতে পারবে তুমি?"

"ফাঁকি তো আমি দিচ্ছি," অশ্রুজিৎ বোঝাতে চেষ্টা করে, "অফিস কামাই করেই তো এসে বসে আছি এখানে?"

রাধা নীরব থাকে। অশ্রুজিৎ তর্ক বাড়াতে চায় না। ভাবে, কলকাতায় শেষ কবে গিয়েছ তুমি?

রাধা তিন-চারমাসে একবার দিন দু'-তিনের জন্য কলকাতা আসে। তখন মা-বাবাকে ছেড়ে বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। বেরোলে বাড়ির কাজেই বেরোয়। অশ্রুজিতের সঙ্গে এক-আধবার দেড়-দু'ঘণ্টার জন্য দেখা হয়। সেও রেস্তরাঁয় কী ক্লাবে।

অশ্রুজিৎ বলল, "এবার সবাইকে জানিয়ে মন্ত্রপড়া বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।"

রাধা রাজি হয় না, "ছুটি পাব না অশ্রু! ওসব কিছুদিন পরে।"

"তা হলে এমনিই বাড়িতে জানিয়ে দাও যে, আমরা বিয়েটা অলরেডি করে নিয়েছি।"

"না অশ্রু, আর ক'টা দিন যাক। বাড়িতে বোমাটা ফাটানোর আগে জমিটা তৈরি করে নিতে দাও।"

"আর কতদিন লাগবে জমি তৈরি করতে, রাধা? ততদিনে বুড়ো হয়ে যাব না তো?" অশ্রুজিৎ হাসে। তার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

রাধা অস্বস্তিবোধ করল, "জানি না, অশ্রু। আজকাল আমার মনে হয়, আমরা বোধহয় একটু হুড়োহুড়ি করে ফেলেছি। তখন বিয়েটা এভাবে না করলেই হত। তুমি নিশ্চয়ই মানবে যে, বিয়ের মতো একটা ব্যাপারের জন্যে আমরা কেউই তৈরি ছিলাম না। আমরা প্রায় খেলার ছলেই ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলেছি।"

"ডু ইউ রিগ্রেট ইট?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল অশ্রুজিৎ, "বিয়েটা করে আমরা কি ভুল করেছি? তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ রাধা? ডু ইউ ওয়ান্ট...?" কথা শেষ করতে পারল না অশ্রুজিৎ।

রাধা তার হাত জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বলল, "প্লিজ, ডোন্ট গেট আপসেট। আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কিছু বলতে চাইনি। বিয়ে তো আমরা করতামই। আমি জাস্ট বলছিলাম যে, তখন তাড়াহুড়ো না করে আমাদের আরও ওয়েট করা উচিত ছিল। আরও কিছুদিন প্রেম করে তারপর বিয়ে করলে কেমন হত?"

অশ্রুজিৎ তর্ক বাড়াল না। কেন যেন তার মনে হল, অজানা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে।

রাধাকে আজকাল প্রায়ই বেঙ্গালুরুর বাইরে ট্যুরে যেতে হয়। অশ্রুজিৎ বেঙ্গালুরুর টিকিট কিনে টিকিট ক্যানসেল করল। কেননা, রাধা জানাল, তখন সে সেখানে থাকবে না। পরপর দু'বার এভাবে

টিকিট বাতিল করার পর শেষে রাধার সঙ্গে দিনক্ষণ মিলিয়ে প্রায় পাঁজিপুঁথি দেখে দুপুর নাগাদ বেঙ্গালুরু পৌঁছে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল অশ্রুজিৎ। এই হওয়া উচিত। রাধার এখন অফিসে থাকার কথা। তবু যেন প্রত্যাশা ছিল অন্য কিছুর। অশ্রুজিৎ ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকল। স্নান সেরে ভাবল, অফিসে রাধাকে ফোন করবে, নাকি একটা...না থাক। ভাবতে-ভাবতে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো বলতেই ভেসে এল রাধার কণ্ঠস্বর, "পৌঁছেছ? আচ্ছা শোনো, ফ্রিজে তোমার জন্যে খাবার রাখা আছে। গরম করে খেয়ে নিয়ো। আমার ফিরতে দেরি হবে।"

"কত দেরি? মানে, ক'টা নাগাদ ফিরতে পারো?"

"ঠিক বলতে পারছি না। ছ'টা, সাড়ে ছ'টা বোধহয় হয়েই যাবে।"

"ঠিক আছে। আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব। আর..."

"আর?" রাধার কণ্ঠস্বর সামান্য অধৈর্য শোনাল। অশ্রুজিতের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ওদিকে অফিসে কাউকে কিছু নির্দেশ দিল মনে হল।

অশ্রুজিৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল। মত বদল করে বলল, "ঠিক আছে, এখন রাখছি।"

"বাই," রাধা লাইনটা কেটে দিল।

ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখতে শুরু করল সে। রাধার জন্য আনা কয়েকটা জিনিস সাজিয়ে রাখল, যেন ঘরে ঢুকেই ওগুলো দেখতে পায়।

খাবার গরম করে খেয়ে খাটে শুল। একটু ঘুমোই। ক'টা বাজে? আড়াইটে। হুঁ, রাধার ফিরতে এখনও চার ঘণ্টা। ঘণ্টাখানেক অন্তত ঘুমোই। ক'টা বাজে? পৌনে তিনটে? না, একটু ঘুমোই। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। সেই ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। একটা

পাশবালিশ থাকলে ভাল হত। রাধার পাশবালিশ নেই, ওই বালিশটাই আপাতত টেনে নেওয়া যেতে পারে। বালিশের তলায় এটা কী রে? ও, রুমাল। রাধার রুমাল। এতেও সেই মিষ্টি গন্ধটা। এই বালিশটাতেই তা হলে রাধা মাথা রাখে। আমিও রাখি। না, ওটা বুকে জড়াই। বেশ লাগছে।

ক'টা বাজল? তিনটে দশ। ঘুম আসছে না কেন? জোর করে ঘুমোতে হবে। জোর করে কি ঘুমোনো যায়? কেন যাবে না, কতবার ঘুমিয়েছি। বিছানায় পড়েছি আর চোখ বুজেছি, ইচ্ছেমতো ঘুমিয়েছি। এত বছর তো এভাবেই কাটল। বরং এসি'টা কমিয়ে ফ্যানটা একটু বাড়াই। একটু হাওয়া লাগুক শরীরে। আঃ! আরাম।

সাড়ে তিনটে বেজে গেল? কেমন শীত-শীত করছে। এসি'টা কি আরও কমাব, নাকি গায়ে একটা চাদর দেব? চাদরই দিই। হ্যাঁ, এটাই ঠিক হয়েছে।

গায়ে চাদর জড়িয়ে গরম লাগছে। চারটে বেজে গেল, অথচ একফোঁটা ঘুম হল না। নাঃ, আজ আর ঘুম হবে না। কিন্তু এখনও দু'ঘণ্টা আমি কী করব? বই পড়ি। এই লেখক বেশ নাম করেছেন আজকাল। লোকে খুব পড়ছে। বেশ নাকি সহজ সরল ঝরঝরে স্মার্ট ইংরেজি। ইয়েস, ওয়ান্স আপন আ টাইম দেয়ার ওয়জ...। দেয়ার ওয়জ় হোয়াট? কী বলছে রে? কিছুই তো বুঝলাম না। আর-একবার সেনটেন্সটা পড়ি। ওয়ান্স আপন...। কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না। ইংরেজিটাই কি ভুলে গেলাম? নাকি, আজকাল পপুলার ইংলিশটাই ভীষণ কঠিন হয়ে গিয়েছে?

বই রেখে দিল অশ্রুজিৎ। ততক্ষণে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। সে রান্নাঘরে গিয়ে কফির জল চড়াল। কফি বানিয়ে খেতে-খেতে চোখ শুধু ঘড়ির দিকে। একসময় সাড়ে পাঁচটা বাজল। অশ্রুজিৎ লাফিয়ে উঠল, যেন এক মিনিট আগে অথবা পরে লাফালে ক্ষতি ছিল! গুটিকয় সিডি হাতে সে গিয়ে দাঁড়াল সিডি প্লেয়ারের কাছে।

এবার কলকাতা থেকে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা আর লুই আর্মস্ট্রংয়ের গানের সিডি এনেছে, রাধাকে বুকে জড়িয়ে ওই গানের সঙ্গে ফক্স ট্রট কিংবা ওয়ালজ নাচবে বলে। সেই আনন্দে গুনগুনিয়ে উঠল, 'অ্যান্ড আই থিঙ্ক টু মাইসেল্ফ হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড।' আঃ! আজ দু'মাস পরে। মনে হচ্ছে কতদিন পরে। কতদিন পরে এলে...হেমন্ত বাজালেও হয়। রাধার স্টকে বোধহয় আছে। সিডি প্লেয়ারে সিডি ঢুকিয়ে মিউজিক সিস্টেম রেডি করে রাখল অশ্রুজিৎ। টেবিল গোছাল যত্ন করে। ফুলদানিতে ফুল, একটা মোমবাতি, ওয়াইনের বোতল আর দুটো গবলেট। ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালাল। ওয়াইনের বোতল আনকর্ক করে দুটো গবলেটে একটু করে ঢালল।

ছ'টা বাজল, কান খাড়া হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই, কখন ডোরবেল বাজে! বাজে না। সাড়ে ছ'টা। তাও বাজে না। সাতটা। সাড়ে সাতটা। ডোরবেল-এর বদলে টেলিফোন বেজে উঠল, "অশ্রু, আই অ্যাম সরি। কিন্তু কিছু করার নেই, এম ডি'র ঘরে মিটিং চলছে। বাড়ি ফিরতে আরও ঘণ্টা-দেড়েক দেরি হবে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে অশ্রুজিৎ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ঘরের চারপাশে। মোমবাতি অর্ধেক খয়ে গিয়েছে। মিষ্টি আলোর বদলে এখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যায় শহরের ঝিকমিকে আলো। ঘরের মধ্যে ভূতুড়ে ভাব। দেওয়ালে ছায়ারা নাচছে। ঘরের আসবাব, ওয়াইনের বোতল, আংশিক ভরতি গবলেট, তাদেরই ভিড়ে মিশে অশ্রুজিতের ছায়াও নেচে চলেছে গবলিনের মতো। অশ্রুজিৎ পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল সাজানো টেবিলের কাছে। একটি গবলেট হাতে নিয়ে বলে উঠল, "চিয়ার্স!" এক চুমুকে পান করে ফেলল। দ্বিতীয় গবলেটের তরলও নিঃশেষ করল একইভাবে। দুটো পাত্র আবার ভরতি করে, চেয়ার ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসল।

গলে যাওয়া মোমবাতি একসময় নিভে গেল। জানলা দিয়ে আসা বাইরের আলোর আভাসে ঘরে জেগে রইল আবছায়া। অন্ধকারে ওয়াইনের বোতল হাতড়াতে গিয়ে টেবিল থেকে ছিটকে গেল গবলেট। মেঝেয় পড়ে ভাঙল। বোতল হাতে নিয়ে সরাসরি ঢকঢক করে কিছুটা পান করল অশ্রুজিৎ। চোয়াল শক্ত করে চেয়ে রইল সামনে অন্ধকারে। হঠাৎ চরম আক্রোশে ছুড়ে দিল হাতের বোতল। দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল, "ইউ বিচ!" দরজার ধাক্কা খেয়ে বোতল ঝনঝন শব্দে ভেঙে মেঝেয় ছড়িয়ে গেল কাচের কুচি। অন্ধকারে কোথাও টেলিফোন বেজে উঠল। বেজে যাক। বাজুক দূরভাষ। নিরুক্ত থাক ওর অজুহাত।

রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরল রাধা। ডোরবেল বাজিয়ে ভিতর থেকে সাড়া পেল না। কোথাও বেরিয়েছে? ভাবতে-ভাবতে দরজায় চাবি ঢোকাতে গিয়ে বুঝল তালা খোলা। ঘুমিয়ে পড়ল? দরজার নব ঘোরাতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা। ঘর অন্ধকার। ভিতরে পা রাখতেই জুতোয় লাগল কাচের কুচি। কী ব্যাপার? "অশ্রু, কোথায় তুমি?" বলতে-বলতে আন্দাজে সুইচ টিপে বাতি জ্বালল। আলোয় ঘর ভেসে যেতে দেখল, অশ্রুজিৎ তারই দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে সামনেই বসে আছে। মুখে তিক্ত হাসি। বলে উঠল, "ওয়েলকাম হোম!"

রাধা বিরক্ত হয়ে বলল, "এত সারক্যাসটিক হওয়ার কী আছে?" ঘরে ঢুকে আসতে-আসতে টেবিলের ছন্নছাড়া দশা, পোড়া মোমবাতি, মেঝেয় ছড়ানো কাচের টুকরো দেখে জানতে চাইল, "আর, এসব কী? হোয়াট হ্যাপেন্ড?"

"সেটা তো তোমাকে জিজ্ঞেস করার কথা," ঠান্ডা গলায় কেটে-কেটে বলল অশ্রুজিৎ।

"মানে?"

"ন্যাকামো করছ কেন? বুঝতে পারছ না কী বলতে চাইছি?"

"কী বলতে চাইছ? অফিস থেকে ফিরতে কেন দেরি হল? ফোন করে তো জানিয়েছিলাম। অফিস থেকে বেরোনোর আগেও ফোন করেছিলাম। তুমি ফোন ধরোনি। আরও কৈফিয়ত চাও?"

"জানতে চাইছি আমাকে এত অবহেলা করার কারণ কী?"

"অবহেলা কোথায় দেখলে?" হাতের ব্যাগটা সোফায় ছুড়ে দিয়ে রাধা বলল, "আমি একটা চাকরি করি। তাতে ফাঁকি দিতে পছন্দ করি না।"

"আমি তোমাকে ফাঁকি দিতে বলিনি অফিস না করে বাড়ি চলে আসতে। আমি শুধু এক্সপেক্ট করেছিলাম, তুমি একটা দিন ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরবে, অন্তত আমার জন্যে।"

"এম ডি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। না বলতে পারিনি," রাধা অশ্রুজিতের চোখে চোখ রেখে বলল, "আমাকে অফিসের সময় বোঝাচ্ছ তুমি? নিজে কী করো? তোমার ফার্মে যন্ত্রের মতো কাজ করো, আমি দেখিনি?"

"কী দেখেছ? তোমাকে আমি কখনও এভাবে অপেক্ষা করাইনি। দুপুর-বিকেল যখনই ডেকেছ, অফিস ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি। নেহাত অপারগ হলে শুরুতেই বলে দিয়েছি, এখন পারব না, পরে অমুক সময়ে আসব।"

রাধা একটু থমকে গেল। পরমুহূর্তেই বলে উঠল, "সে তখন করেছ। এখনও কি একইভাবে অফিস কেটে সময় দিতে পারবে?"

"পারব না? পারছি তো। নইলে প্রতি মাসে বেঙ্গালুরু উড়ে আসছি কীভাবে? অফিসের কাজ ফেলেই আসি। আর এখন-তখনের কথা উঠছে কেন? কী এমন হয়ে গিয়েছে এখন?"

রাধা অবসন্ন ভঙ্গিতে সোফায় বসে পড়ল। "সরি, অশ্রু। বুঝতে চেষ্টা করো, আমার করার কিছু ছিল না। মিটিংটা ভীষণই জরুরি ছিল।"

অশ্রুজিৎ তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল রাধার দিকে। জিজ্ঞেস করল, "কাল কি তুমি আমার জন্য ছুটি নিচ্ছ? অন্তত একবেলা?"

রাধা মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "না। সম্ভব নয়। কালও সকালে বেরোব। ফিরতে কালও দেরি হতে পারে। নতুন প্রজেক্ট ধরা হয়েছে। তার মূল দায়িত্ব আমার।"

অশ্রুজিৎ নির্বাক বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। ধীরে-ধীরে বলল, "তুমি যে এত ব্যস্ত, আমায় সময় দিতে পারবে না, সেটা আগে জানালে না কেন? আমি যখন বললাম এই দিন আসছি, কেন বললে না যে, অশ্রু এখন এসো না?"

রাধার মুখ কালো হয়ে উঠল। কী জবাব হয় এর? সে মৃদুস্বরে বলল, "আমি বলতে পারিনি।"

"কেন?"

"কেন?" রাধা মুখ তুলে সোজাসুজি অশ্রুজিতের দিকে তাকাল, "তুমি বুঝতে পারোনি কেন তোমাকে বারণ করতে পারিনি?"

"না। কয়েকটা কথা স্পষ্ট বোঝা ভাল।"

"এখনও আমায় বলে বোঝাতে হবে?"

অশ্রুজিৎ বলল, "আমি দুঃখ পাব বলে?"

রাধা জবাব দিল না। তার চোখের ভাষায় অশ্রুজিৎ বুঝল তার অনুমান নির্ভুল। সামলে নিয়ে বলল, "আরও আগে কেন বলোনি রাধা? কেন বলোনি যে, ভালবাসা শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু আমাকে সহ্য করছ? কবে থেকে এমন হয়ে গেল? কেন হল রাধা?"

"আমি জানি না, অশ্রু," রাধা থেমে-থেমে বলল, "নতুন কিছু কি হয়েছে? জানি না। মনে হয় এ তো হওয়ারই ছিল। বিবাহিত জীবনের অনেক দাবি। আজ আমি নিশ্চিত যে, সেই দাবি মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমার বিয়ে করা উচিত হয়নি।"

"আমি তো কখনও বেশি কিছু চাইনি, রাধা। বলিনি, কলকাতায়

এসে থাকো, ঘরসংসার দ্যাখো। মাসে-দু'মাসে একবার ক'দিনের দেখা। সেও কেন তোমার কাছে অসম্ভব?"

"এভাবে প্রশ্ন কোরো না অশ্রু। নিজেকে বড় অপরাধী লাগে। কতদিন এভাবে চলবে? পেটে বাচ্চা এসে গেলে আমার পায়ে শিকল পড়ে যাবে। আমি পারব না অশ্রু। আমি অনেক উপরে উঠতে চাই। কেরিয়ার আর সংসার একসঙ্গে হয় না। সংসারের জন্যে আমি কেরিয়ারে কমপ্রোমাইজ় করতে পারব না।"

"কীসের কমপ্রমাইজ? আমার তো মনে হয় না। যেসব মানুষ সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে তারা সংসার করে না?"

রাধা হাসল, "যেসব মানুষ নয়, যেসব পুরুষ বলো। আমি নারী, তোমার স্ত্রী, তোমার তুলনায় আমার সামনে সংসার অনেক বেশি দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াবে।"

"চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?"

"সে চেষ্টা সফল না হলে? তখন কোথায় যাব আমি? না অশ্রু, জীবন নিয়ে এসব পরীক্ষায় সময় বয়ে যাবে। নেট রেজ়াল্ট হিসেবে সাফার করবে আমার কেরিয়ার। হবে না।"

"তোমার ভয় হয়তো সবটা ভিত্তিহীন নয়," মেনে নিল অশ্রুজিৎ। বলল, "কেরিয়ারের চিন্তা তো আমারও আছে। কিন্তু তা বলে সংসারে ভয় তো নেই। বাচ্চাকাচ্চা হলে আমাকেও তো বাবার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তা করতে গিয়ে কেরিয়ারে কমপ্রমাইজ করতে হলে কি আমি সেটুকু করব না? কেরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

রাধা বলল, "জীবন কাকে বলে, অশ্রু? তোমার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির তফাত আছে।"

অশ্রুজিৎ চোখে প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে আছে দেখে রাধা বলল, "দ্যাখো, তোমাদের পরিবার সোসাইটির এলিটদের মধ্যে পড়ে। তোমাদের আভিজাত্যের দীর্ঘ ইতিহাস। ভারতজোড়া তোমাদের

ফার্মের ব্যাবসা। এই সবই তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মান কোনওটাই তোমাকে নতুন করে অর্জন করতে হয়নি, হবেও না। তোমার যা আছে, তাকেই টিকিয়ে রাখতে হবে শুধু। বাকি থাকে এগুলো আরও বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু আমার কিছুই নেই। বাবা ব্যাঙ্কে সামান্য চাকরি করেন। তাও অনেক কষ্টে এটুকু অর্জন করতে পেরেছেন। ঠাকুরদা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ছেলেঠ্যাঙানো মাস্টার ছিলেন, বাকি সময় বাড়ি-বাড়ি পুজো করে সংসার চালাতেন। তাঁর বাবা ছিলেন পূর্ণ সময়ের গরিব পুরোহিত। না অর্থ, না প্রতিপত্তি, না সম্মান। আমার প্রায় শূন্য থেকে শুরু। আগামী সম্ভাবনার এককোঁটাও আমার পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।"

অশ্রুজিৎ বলল, "আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি তো..."

"অশ্রু, অশ্রুজিৎ সান্যাল," রাধা অধৈর্য কণ্ঠে বলল, "নিজেকে আমার জায়গায় বসিয়ে দ্যাখো। তোমার উত্তরাধিকার যদি আমার মতো হত, আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ তুমি, তুমি কী করতে?"

অশ্রুজিৎ ঘাড় নাড়ল, "বলতে পারব না। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে শুরুতে ফিরে যাওয়া তো সম্ভব নয়।"

"ভুল সংশোধন তো সম্ভব।"

অশ্রুজিৎ বলল, "ডিভোর্স চাইছ?"

"জানি না অশ্রু, কী চাইছি। কিছুই তো নেই আর, কী থেকে ডিভোর্স চাইব! অথচ, কিছু নেই বলেই ডিভোর্সই চাইতে হয়, শুকনো আইনের বাঁধন কাটতে। কিন্তু আমার এখন এসব আইনি কারবার করার মতো সময় নেই। এমনও না যে, আর কাউকে বিয়ে করব," অশ্রুজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাট সুনার অর লেটার, ইউ উইল নিড আ ওয়াইফ। ডিভোর্সটা তোমার দরকার হবে। সময়-সুবিধে মতো তুমিই প্রসেসটা শুরু করো। কোর্ট থেকে ডাক এলে যা করণীয় আমি করে দেব।"

কথা আর কিছু বাকি নেই তা হলে। সম্পর্ক তো নেই-ই। বুঝে ওঠার আগেই কবে চুকেবুকে গিয়েছে। অশ্রুজিৎ উঠে ব্যাগ গোছাতে শুরু করল। রাধা বলল, "এ কী করছ?"

"ব্যাগ গোছাচ্ছি।"

"সে তো দেখতে পাচ্ছি। কেন?"

"চলে যাব বলে।"

"অশ্রু, বাত এখন প্রায় বারোটা, এত রাতে কোথায় যাবে তুমি?"

"কোনও হোটেলে। এই শহর কি এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে?"

"এসব পাগলামো কোরো না, অশ্রু। আজ রাতটা অন্তত এখানে থাকো।"

"কী করে থাকব রাধা? এক ছাদের নীচে পাশাপাশি থাকার কোনও যুক্তি কি আর আমাদের আছে?"

রাধা অশ্রুজিতের হাত ধরে বলল, "যুক্তি না থাক, তা ছাড়াও তো কিছু আছে। আমাকে ভুল বুঝো না অশ্রু। এটা ঠিক যে, ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করাটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি। তাতে কোনও ভুল নেই। দাম্পত্য সম্ভব নয়, এ-ই মাত্র। অনুভূতি শেষ হয়ে যায়নি। প্লিজ অশ্রু, এই রাতে অন্য কোথাও যেয়ো না," হাত ছেড়ে দিয়ে অনুনয় করল, "তুমি এখন এইভাবে চলে গেলে সারারাত আমি শান্তি পাব না। প্লিজ অশ্রু, সারাটা দিন অফিসে খেটে এসে এখন আমি বড় ক্লান্ত। এখনও হাত-মুখও ধুইনি। আমাকে আর যন্ত্রণা দিয়ো না," রাধা দ্রুতপায়ে ঢুকে গেল শোওয়ার ঘরে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অশ্রুজিৎ ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। মিনিটদশেক পর রাধা বেরিয়ে এল, "চলো, খেয়ে নিই।"

অশ্রুজিৎ ক্লান্ত হাসল, "সরি রাধা, তোমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু খিদেও নেই। তুমি খেয়ে নাও।"

রাধারও খিদে নেই বোধহয়। সে খাবারের জোগাড়যন্ত্র করার কোনও লক্ষণ দেখাল না। ততক্ষণে অশ্রুজিৎ সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। রাধা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওখানে ঘুমোতে তোমার অসুবিধে হবে না?"

"না।"

"আচ্ছা। গুডনাইট।"

"গুডনাইট।"

রাধা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। শুধুই ভেজিয়ে দিল, নাকি খিলও তুলল তা বোঝা গেল না।

সারারাত ঘুম এল না অশ্রুজিতের। থেকে-থেকে কেবলই চোখ চলে যেতে থাকল বেডরুমের বন্ধ দরজার দিকে। সোফা থেকে উঠে সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রায় অদম্য। একবুক ব্যথা চেপে অবুঝ মনের সঙ্গে লড়তে-লড়তে ভোরের প্রতীক্ষায় নিশ্চল শুয়ে রইল।

ভোর চারটে। অশ্রুজিৎ সোফা ছেড়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বাইরের পোশাকে তৈরি হয়ে নিল। নিঃশব্দে বেডরুমের সামনে গিয়ে দরজায় হাত রাখল। একটু ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। মনে হল, রাধা এদিকেই পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। মনে-মনে অশ্রুজিৎ বলল, 'চললাম, গুডবাই।' দরজা ফের ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এল সোফার কাছে। ব্যাগ কাঁধে তুলে বেরিয়ে গেল রাধার ফ্ল্যাট থেকে। শোবার ঘর থেকে বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল রাধা। এত একলা এই ঘর। দমবন্ধ হয়ে আসে। তবু, চিত হয়ে নিষ্পলক চেয়ে রইল ছাদের দিকে। এই ছিল ভবিতব্য।

চার অক্ষরের একটা অতি পরিচিত শ্রুতিমধুর বাংলা স্ল্যাং সেদিন

বেঙ্গালুরু থেকে ফেরার পথে প্লেনে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বেশ জোরে আওড়ে উঠেছিল অশ্রুজিৎ। সহযাত্রীরা অনেকেই হয়তো শুনতে পেয়েছিল। এয়ারহোস্টেস ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল। বাঙালি ছিল কি সে?

আজ সপ্তাহখানেক পরে অফিসে নিজের চেম্বারে বসে সেই স্ল্যাং আবার আওড়াল অশ্রুজিৎ। 'শালা, আমি ওই...।' আমার এই 'আমিটা'র সবটাই তা হলে উত্তরাধিকার! যেন এক ক্লোন। রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্মের মতো রিপ্রেজেন্টেটিভ সান্যাল। আমি বলে আলাদা কেউ নেই।

আমি নেই কোথাও। রাধা তা হলে কাকে ভালবেসেছিল? সেদিনও যে ন্যাকামো করে বলল, 'আমি এখনও তোমাকেই ভালবাসি', ওর সেই তুমিটা কে? শালা কোন হরিদাস? সান্যাল পরিবার ছাড়া, পারিবারিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য ছাড়া অশ্রুজিৎ আসলে এক হরিদাস। এক সুবিশাল জিরো। একজাতের জানোয়ারের বাচ্চা। যার উত্তরাধিকার বংশরক্ষায়, শুধু বংশবৃদ্ধিতে। রাধার মতো শূন্য থেকে শুরু হলে আমি কী চাইতাম? কীভাবে চাইতাম? কোথায় পৌঁছোতাম? রাধা! অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না এক মেয়ে, এখনও আইনত আমার স্ত্রী।

ইন্টারকম বেজে উঠল প্যানপেনিয়ে। বাবা! অশ্রুজিৎ ফোন তুলতেই ঝেঁঝে উঠলেন গগন, "ব্রিটিশ ইলেকট্রিকের ফাইলটার কী হল? এখনও পাঠাসনি কেন? লোধা আমাকে ফোন করেছিল। এখনই পাঠিয়ে দে।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অশ্রুজিৎ বলল, "ওটা এখনও হয়নি।"

"হয়নি!" চাপা কর্কশ স্বরে ধমকে উঠলেন গগন, "তোর হয়েছে কী অশ্রু? এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে গেলি কীভাবে? লোধাকে আমি কী বলব?"

অশ্রুজিৎ জবাব দিল না। গগন গম্ভীর স্বরে বললেন, "ফাইল আমার টেবিলে পাঠিয়ে দে। অভিকেও আমার ঘরে আসতে বল। আমরা দেখছি। অশ্রু, গুডউইল ভাঙা খুব সহজ, কিন্তু ওই একই জিনিস তৈরি করতে শতাব্দী কেটে যায়। এত পুরনো বনেদি ফার্ম আমাদের। গুডউইলটা এভাবে নষ্ট করিস না। আমি চিরকাল থাকব না। এই ফার্ম তোর আর অভিরই হবে।"

"না। আমার না।"

"মানে!"

"আমি ফাইল তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর...," একটু থেমে অশ্রুজিৎ বলল, "আমি অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আজ আর ফিরব না।"

গগন একবার ভাবলেন, জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় যাচ্ছিস। কী ভেবে জিজ্ঞেস করলেন না।

পরদিন থেকে অশ্রুজিৎ অফিসে আসা বন্ধ করে দিল। মা-বাবার জিজ্ঞাসাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট কোনও জবাব দিল না। বাইরে-বাইরে কোথায় ঘুরতে থাকল তার আন্দাজ পাওয়া গেল না। ঘরে থাকলে কখনও বই পড়ে, কখনও চুপ করে বসে থাকে। কয়েকদিন পরে মধুরা চিন্তিত হয়ে স্বামীকে বললেন, "কী হল গো?"

গগন মনে-মনে ভাবলেন, তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম। মুখে বললেন, "বুঝতে পারছি না। দেখে ডিপ্রেসড মনে হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে না সেটা টেম্পোরারি না পার্মানেন্ট। আর ক'টা দিন যাক। তেমন বুঝলে ডাক্তার-বদ্যি করতে হবে।"

অফিসের পথে গাড়িতে বসে গগন ভাবলেন, ক'টা দিন অশ্রুজিতের অভাব অফিসে অনুভূত হবে। তাঁর নিজের উপরে চাপটা বেশি পড়বে। চট্টোপাধ্যায়কেও একটু বেশি লোড নিতে হবে। তবে সামলে নেওয়া যাবে। অভিজিৎ আজকাল অফিসে আগের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে। তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলে না

গেলেও, দায়িত্ববোধ বেড়েছে। আরও বাড়বে। অফিসেও আরও বেশি খাটবে। জগৎকে হাতের মুঠোয় পেতে অনেক কিছুই সে করতে প্রস্তুত। অভি অশ্রুর মতো কাজে সর্বদা নিখুঁত নয়, অমন যান্ত্রিক নয়। তাই কখনও একেবারে অচল হয়ে বসেও যাবে না। অভিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, সে দাদার মতো বিবাগী স্বভাবের নয়।

বিখ্যাত স্মিথ-সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার অভিজ্ঞ গগনবিহারী সান্যালের দীর্ঘদিনের হিসেব নির্ভুল প্রমাণিত করে কোম্পানির জুনিয়র পার্টনার তাঁর বড় ছেলে মাস কয়েক পরে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। না কোনও কারণ, না কোনও পিছনে ফেলে যাওয়া চিরকুট। তাকে খোঁজার চেষ্টায় ত্রুটি রাখেননি গগন। থানা-পুলিশ করা, কাগজে-টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া, কিছুই বাদ রাখেননি। তবু খোঁজ পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষ নামের সুবিশাল এই জনসমুদ্রে নগণ্য একটি জলবিন্দুর মতো হারিয়ে গেল বছর ছাব্বিশের যুবক অশ্রুজিৎ সান্যাল।

দ্বিতীয় চরণ

...'তুমি তো অহরহ
হাঁটছ রূঢ় সেই ভিড়ের মধ্যে।'

কবি বিনয় মজুমদার

দুর, এই জীবন, এই রোজকার বাঁচা, এই চোদ্দোপ্যাঁচে আটকে পড়া একার সংসার, পথের ধারে বনসৃজন প্রকল্পের নিয়মিত দূরত্বে অবস্থিত সারিসারি বৃক্ষের মতো এই একাকী স্থবির অস্তিত্ব। ভাল্লাগে না। আজ দিল্লি, কাল মুম্বই, পরশু বেজিং, তরশু দুবাই, বিমানে বিজনেস ক্লাসে প্রতিদিন। চাকরি এঁটুলি হয়ে গায়ে লেগে থাকে। এত ছোটা, এত ওড়া, তবু জীবন আসে না হাতের মুঠোয়, জীবন কোথাও পৌঁছোয় না। প্রতিদিন দেখি, নতুন মানুষ, এত ওঠা-বসা। ক'টা দিন মুক্তি চাই। কেবল কয়েকটা দিন ট্র্যাকের বাইরে, রানওয়ে থেকে দূরে। জানলা দিয়ে দেখা যায় এক অপরিচিত বিমানবন্দর। প্লেন এখনই ল্যান্ড করবে, তারপর স্থবির হবে এই বাহন। মন এখনও ছুটছে। ভাবছে, ভাল্লাগে না। একেবারে সাত-সাতটা দিন ছুটি নিয়ে বসলাম। সিটবেল্টে বন্দি রাধা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল। একুশ বছর বয়সে চাকরি শুরু করেছে সে। দেখতে-দেখতে হল তারও দশ বছর। বারদুই কোম্পানি বদলানো হয়ে গিয়েছে রাধার। আরও হয়তো বদল হবে। নিজের একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেলেও কেরিয়ার এখনও অনেক বাকি। এখনই কোম্পানিতে রাধা রায় এক অন্যতম স্তম্ভ। তাকে ছাড়া

কাজ চলে না। কর্পোরেট সংস্কৃতিতে আসলে কেউই ইনডিসপেন্সেবল নয়। নিজের দাম প্রতি মুহূর্তে আদায় করে নিতে হয়। প্রতিটি ডিল, কনট্রাক্ট, নেগোশিয়েশনে যাচাই হয় এগজ়িকিউটিভের মাহাত্ম্য। সপ্তাহে সাতটা দিন। ক'দিনই বা, ছুটতে-ছুটতে আর উড়তে-উড়তেই চলে যায়। কিন্তু বড় দীর্ঘ ছুটির একটা সপ্তাহ। এর মধ্যে কোনও কাজ রাধা রায় ছুটিতে গিয়েছে বলে আটকে গেলে বড়কর্তা বিরূপ হবেন। আর রাধার কোনও কলিগ যদি সেই সমস্যা নিজের দায়িত্বে উতরে দেয়, কোম্পানির কাছে রাধার তুলনায় সেই কলিগের কদর বাড়বে। রাধা রায় ডিসপেন্সেবল হয়ে পড়বে। উন্নতির পথে পরের ধাপটায় পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। তারপরেও তো বাকি থাকে আরও কত ধাপ। পৌঁছোতে হবে এক নম্বরে। কর্তৃত্বের বুড়ি ছুঁতে বুড়িয়ে গেলে চলবে না। ছুটি বাতিল করে দেবে? কিন্তু ছুটিও যে টানছে। যখনই ভেবেছিল ছুটি নেবে নাকি, মন তখনই ছুটি নিয়েছে।

শেষ এমন লম্বা ছুটি রাধা নিয়েছিল সেই বছরদশেক আগে, চাকরি শুরুর সময় বাধ্য হয়ে। অশ্রুজিৎ তার জীবন থেকে তখন সবে বিদায় নিয়েছে। কলকাতায় বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন। হার্টের ব্যামো। খবর পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেঙ্গালুরু থেকে উড়ে এসেছিল রাধা। টানা দশদিন ছুটি নিয়ে বাবার চিকিৎসা করিয়েছিল। বাইপাস সার্জারি হল। বাবা অনেকটা সুস্থ হওয়ার পর সে বেঙ্গালুরু ফিরে গিয়েছিল। মাসখানেক পরে আবার কলকাতা এসে মা আর বাবা দু'জনকেই বেঙ্গালুরু নিয়ে গিয়ে কয়েক মাস নিজের কাছে রেখেছিল। মা বা বাবা কারওই এর পর বড় কোনও অসুস্থতা দেখা দেয়নি। রাধাও তখন দু'-তিন মাসে এক-আধদিনের জন্য কলকাতা এসেছে। আগামীবছর বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করবেন। রাধা ভাবছে, তখন মা-বাবাকে নিজের কাছে এনে রাখবে। বাবা এখনও তাতে রাজি নন। অবশ্য মা-বাবা কলকাতায় না বেঙ্গালুরুতে তার বাড়িতে,

তাতে খুব কিছু আসে-যায় না। সে নিজে ক'টা দিনই বাড়িতে থাকে? প্রতি সপ্তাহেই তো ট্যুরে বেরোতে হয়। সেদিক দিয়ে দেখলে হয়তো বাবার বিবেচনাই ঠিক। কলকাতায় চেনা পরিধির মধ্যে ওঁরা ভাল থাকবেন। বরং রাধা চলে আসতে পারে কলকাতায়। সেই চিন্তাও মাথায় আছে। তেমন অফার পেলে চলে আসবে।

এবারের ছুটিটা নিতে হল খানিকটা মায়ের জারিজুরিতে.আর খানিকটা ঋকের চাপে। মা আজকাল প্রায়ই বিয়ের কথা তুলছেন। বলছেন, 'তোর বয়স হয়ে যাচ্ছে রাধা, এবার বিয়েটা করে নে।' ঋকও চাইছে বিয়েটা সেরে নিতে। মা এখনও জানেন না যে, আইনের চোখে রাধা বিবাহিত। ঋক জানে। ঋক দেবনাথ রাধারই মতো কর্পোরেট এগজ়িকিউটিভ। চাকরিসূত্রে দিল্লিতে পোস্টেড। অর্থ, প্রতিপত্তি এবং পদমর্যাদায় রাধায় চেয়ে পিছিয়ে। কিন্তু মানুষ হিসেবে অসাধারণ। বুদ্ধিমান এবং সমঝদার। ওর সঙ্গে সময় কাটাতে ভাল লাগে। দু'জনেই কর্পোরেট এগজ়িকিউটিভ হলেও, ওর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাবটা অনুভব করে না রাধা। তার সুপিরিয়রিটি ঋক খোলামনে মেনে নেয়। বছরচারেক আগে দিল্লিতে এক কনফারেন্সে ঋকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারপর বন্ধুত্ব ক্রমশ বেড়ে উঠে প্রেম। ইদানীং ঋক বিয়ের কথা বলছে। রাধারও মনে হচ্ছে, এবার বিয়েটা করে নিলেই হয়। জীবনভর ছোটাছুটির মধ্যে কোথাও কারও কাছে থিতু হওয়া বোধহয় ভাল। অন্তত স্থিরতার ভাবটা জরুরি। প্রেম শুরুর দিনগুলোয় একদিন রাধা ঋককে জানিয়েছিল, সে খাতায়-কলমে অন্য একজনের স্ত্রী। খুলে বলেছিল অশ্রুজিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের কথা এবং এও বলেছিল, সেই বিচ্ছেদকে সরকারিভাবে নথিভুক্ত করা হয়ে ওঠেনি। সে আর সম্ভবও নয়। অশ্রুজিতের কোনও সংবাদ কারও কাছে নেই।

আজ দশ বছর তার কোনও খবর নেই। কয়েকমাস আগে ঋক বলছিল, "সে জীবিত কি মৃত তাও কেউ জানে না। ওই বিয়ের কোনও মূল্য আজ আর নেই। মানুষটা যদি বেঁচেও থাকে. তবু দশ বছরে যে যোগাযোগ করেনি, তার কাছ থেকে একতরফা ডিভোর্স নেওয়ার আইনি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে।"

"আছে ঠিকই, কিন্তু তার হাজার হ্যাপা," রাধা বেজার মুখে বলল, "বিয়ের প্রমাণ দাও, সাক্ষীদের ডাকো. স্বামী লোকটার বাড়ির লোকদের ডাকো। নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজখবর কী করা হয়েছে তার তথ্যপ্রমাণ দাও। সব মিলিয়ে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেওয়া ব্যাপার। কাগজে-টিভিতেও হয়তো খবর হয়ে যাবে। অফিসে লোকজন কানাকানি করবে। ওই গোলমালে যেতে চাইছি না।। তা ছাড়া, আজ এতদিন পরে ওই বিয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হলে আমার বাড়ি এবং অশ্রুর বাড়ি থেকে কত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমায়, ভাবো!"

"তা হলে?" নিরাশ মুখে প্রশ্ন করল ঋক।

"ডিভোর্সটা যথাসম্ভব কম হইচইয়ে সারা যেত, যদি সেটা মিউচুয়াল কনসেন্টে হত।"

"মিউচুয়াল কনসেন্টে!" ঋক অবাক হয়ে বলল. "সেটা সম্ভব যদি লোকটাকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত করানো যায়। কিন্তু তার তো কোনও পাত্তাই কেউ জানে না। ও আদৌ বেঁচে আছে কি না..."

"হয়তো বেঁচে নেই," রাধা ভাবুক মুখে বলল, "সেক্ষেত্রে স্ক্যান্ডাল এড়িয়ে ডিভোর্স পাওয়ারও উপায় নেই। কিন্তু যদি ও বেঁচে থাকে, যদি শেষ একটা চেষ্টা করে ওর সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করা যায়?"

"কীভাবে সেটা সম্ভব? কেউ যার খোঁজ পায়নি...আমার তো কোনও উপায় চোখে পড়ছে না," ঋক মাথা নাড়ল, আরও বলল,

“তা ছাড়া ওর কোনও খোঁজ যদি পাওয়াও যায় তো, এতদিন পরিচিত মানুষজনের সামনে যে আসতে চায়নি সে আজ তোমায় ডিভোর্স দিতে কেন আসবে?”

“সেটা ঠিক,” ঋকের যুক্তি মেনে নিয়েও রাধা বলল, “কিন্তু একটা চেষ্টা করে দেখা তো যায়!”

“কিন্তু কীভাবে?” ঋক চিন্তিত মুখে বলল, “তুমি নিজেই বলেছ যে, ওর বাবা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাতে যখন কাজ হয়নি, আজ আমরা এতদিন পর...”

“ওঃ ঋক!” রাধা বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, “তোমাদের এই মুশকিল, আগে থেকেই বড্ড নেগেটিভ চিন্তা করো।”

“ওকে,” ঋক দু’হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, “মনে হয় কোনও ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এই কাজে লাগানো যেতে পারে।”

“না,” মাথা নাড়ল রাধা, “পুলিশ তো আগেই খুঁজেছে, কোনও পাত্তা করতে পারেনি। এতদিন পরে ডিটেকটিভ এজেন্সি কী করবে?”

“তা হলে?”

“আমরা বিজ্ঞাপন দিতে পারি।”

“লোকে পাগল করে দেবে তোমাকে,” ঋক হাসতে-হাসতে বলল, “আজেবাজে লোকজন আর কিছু না হোক, স্রেফ তামাশা দেখার জন্যে টেলিফোন করে, চিঠি লিখে রাতদিন জ্বালিয়ে মারবে।”

“ঠিকানা দেব না, ফোন নম্বরও না। বক্স নম্বরে জবাব পাঠাতে বলব।”

“তাতে ও সাড়া দেবে? আমার তো মনে হয় ..”

“ওঃ ঋক!”

“ওকে,” রাধার ধমক খেয়ে ঋক সব দ্বিধা গিলে ফেলে তৎপর হয়ে বলল, “বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক।”

ভারতবর্ষের সমস্ত নামী ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে নিরুদ্দেশ-সংবাদ স্তম্ভে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল— 'তোমার স্ত্রী তোমায় খুঁজছে। ফক্স ট্রট, সুমচু।'

বিজ্ঞাপনের বয়ান রাধার তৈরি। ঋকের মুখ ঈষৎ ম্লান হয়ে উঠতে রাধা তার হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "সরি ঋক। এটা শুধু সেন্স অফ আর্জেন্সিটা প্রকাশ করার জন্য। আর, নিজেরা যা-ই ভাবি, আইনের চোখে এখনও আমি ওর স্ত্রী। সেই বাঁধন কাটাতেই তো এই তোড়জোড়?"

ঋক সামলে নিয়ে বলেছিল, "আমি বুঝি রাধা, তোমায় ব্যাখ্যা করতে হবে না। কিন্তু, ওই ফক্স ট্রট আর সুমচু ব্যাপারটা কী? ফক্সট্রট তো এক ধরনের বিদেশি নাচ।"

"আর, সুমচু একটা জায়গার নাম।"

"দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা কী?"

"কোনও সম্পর্ক নেই। অশ্রু আর আমার মধ্যে ওটা একটা জোক। যেমন সোনার পাথরবাটি, যেমন কাঁঠালের আমসত্ত্ব, তেমনই সুমচুতে ফক্স ট্রট," খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল রাধা।

"জোক!" ঋক অবাক হয়ে বলেছিল, "এতদিন পরে লোকটাকে ডাকছ, তাও শুরুতেই রসিকতা!"

"রসিকতা ছাড়া কী ঋক? শুরু আর শেষ, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের সবটাই তো আজ বিরাট এক রসিকতা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।"

"বড় গোলমেলে রসিকতা, ভেরি পেনফুল টু।"

বিজ্ঞাপন বক্স নম্বরে দেওয়া হলেও অজস্র জবাবি চিঠি এল। ঋক আর রাধা হিমশিম খেয়ে গেল তার প্রতিটি পড়ে দেখতে। প্রতিটিতেই বাজে রসিকতা আর নয়তো কুৎসিত শয়তানি। কোনওটিতেই স্বাক্ষরকর্তার নাম অশ্রুজিৎ সান্যাল নয়। দিনপনেরো পরে চিঠির হিড়িক কমল। মাসদেড়েক পর থেকে চিঠি আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। মাসতিনেক

পরে যখন রাধা সব আশা ত্যাগ করেছে, তখন একটা টেলিফোন এল। রাধার অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে এক ব্যক্তি যেন বহুদূর থেকে বলল, "আমি কি রাধা রায়ের সঙ্গে কথা বলছি?"

রাধা অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?"

অন্য প্রান্ত তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করল, "অমুক দিন অমুক কাগজে কি আপনিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?"

রাধা সতর্ক হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে বলছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন?"

"আপনি যদি ওই বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, তা হলে যাকে খুঁজছেন তার সন্ধান আমি দিতে পারি।"

রাধার হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠে পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়োতে শুরু করল। তার ধকধক আওয়াজ নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে সে। হৃৎপিণ্ড ফুলেফেঁপে উঠে বুকের খাঁচায় মাথা ঠুকছে। এখনই যেন দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসবে। সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে-করতে কর্কশ স্বরে বলল, "তা না হয় দেবেন বুঝলাম. কিন্তু নিজের পরিচয় দিতে চাইছেন না কেন?"

"পরিচয় তো আপনিও দিতে চাইছেন না ম্যাডাম! কাগজে বিজ্ঞাপনটা কি আপনিই দিয়েছিলেন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাধা অবশেষে মরিয়া হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম, কিন্তু..."

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই অন্য প্রান্ত বলল, "থ্যাঙ্কস, নিন কথা বলুন।"

কথা বলব? কার সঙ্গে? রাধা অবাক হয়ে ভাবতে না-ভাবতে তার কানে ভেসে এল দূরাগত, তবু পরিচিত কণ্ঠস্বর, "অশ্রুজিৎ বলছি।"

আপাদমস্তক অবশ হয়ে যাওয়া অনুভব করল রাধা। ইন্দ্রিয়গুলো যেন আর বাধ্য নয়। কেঁপে ওঠা হাতে বহু কষ্টে রিসিভার ধরে রেখে দলা পাকানো গলায় বলল, "আমি রাধা।"

"এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম। কেমন আছ?"

"ভাল। তুমি কেমন?"

"নেভার বেটার।"

"ওঃ।"

"বিজ্ঞাপন দিয়েছ কেন? কিছু দরকার আছে?"

রাধা তখনই জবাব দিতে পারল না। অশ্রুজিৎ বলে উঠল, "বিয়ে করবে? ডিভোর্স চাও?"

রাধা রিসিভারটা কান থেকে নামিয়ে হাতে চেপে রেখে গলা ঝেড়ে নিল। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ফের রিসিভার কানে নিয়ে সহজ গলায় বলল, "হ্যাঁ। তোমার অনুমানশক্তি এখনও বেশ প্রখর।"

"সবক্ষেত্রে নয়, রাধা। সবক্ষেত্রে নয়। কাকে বিয়ে করছ?"

"আছে একজন। তুমি চিনবে না," এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞেস করল, "আমার ফোন নম্বর কোথায় পেলে?"

"তোমার পুরনো অফিসে ফোন করেছিলাম। ওখানেই একজন নম্বরটা দিল।"

"ও।"

"চেষ্টা করলে সকলেরই খবর পাওয়া যায়, রাধা," অশ্রুজিৎ হাসল মনে হল।

"সে তো ঠিকই। আমি তো নিরুদ্দেশে যাইনি। কিন্তু যে গিয়েছে তার খবর কীভাবে পাওয়া যায়, অশ্রু?"

"বিজ্ঞাপন দিয়ে। কোনও সন্দেহ নেই," অশ্রুজিৎ হাসল। অট্টহাস্য করে উঠল।

"তুমি বেশ মজা পেয়েছ মনে হচ্ছে?"

"তা একটু পেয়েছি। ভাবছি, একটা কাগজের সম্পর্কও চাইলেই কাগজের মতো ছিঁড়ে ফেলা যায় না। তারও অনেক তরিবত থাকে।"

"তা থাকে," রাধা ঠান্ডা গলায় বলল।

"তোমার ভঙ্গিতে একেবারে রসকষ নেই রাধা। এতদিন পরে কথা হচ্ছে। আমি বেঁচে আছি না মরে গিয়েছি তাও তো জানতে না? ভেবেছিলাম, একটু মিষ্টি আহা-উহু করবে। দেখছি, সে গুড়ে বালি!" বয়ান অভিযোগের হলেও অশ্রুজিতের কণ্ঠস্বর অভিযোগকারীর মতো শোনাল না। আন্তরিক অনিচ্ছে সত্ত্বেও রাধা মনে-মনে চটে উঠল। সে শীতল স্বরে বলল, "আমি বরাবরই জানতাম তুমি বেঁচে আছ।"

"কীভাবে জানলে?" ভয়ানক সিরিয়াস শোনাল অশ্রুজিৎকে। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল তার অভিনয়। সে জিজ্ঞেস করল, "হাত গুনে?" ফের ফেটে পড়ল হাসিতে।

রাধা মনে-মনে অপ্রস্তুত বোধ করল। সে ধমকে উঠে বলল, "স্টপ ইট অশ্রু। আমি এখন ডিভোর্স চাইছি।"

"ইউ উইল গেট ইট বেবি, ইউ উইল গেট ইট। কীভাবে চাও?"

"মিউচুয়াল কনসেন্টে।"

"অফকোর্স। ইট হ্যাজ় টু বি মিউচুয়াল। এনি ডে। কিন্তু রাধা..."

"কিন্তু কী?" আশঙ্কায় রাধার হৃৎস্পন্দন আবার বেড়ে উঠল।

"আমি এখনই কলকাতা বা বেঙ্গালুরু যেতে পারব না। তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। কাগজপত্রে সইসাবুদ যা লাগবে করে দেব। কোর্টের ব্যাপার তোমাকেই সামলাতে হবে। শুধু শেষে একবার আদালতে গিয়ে মুখ দেখিয়ে আসব। তোমাকে সেইভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে হবে।"

"তা না হয় করব, গরজ যখন আমার। কিন্তু কোথায় তোমার সঙ্গে মিট করব? তুমি কোথায় আছ এখন?"

"তাওয়াং।"

"কোথায়?"

"তাওয়াং, অরুণাচল প্রদেশ।"

"মাই গুডনেস," রাধার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। সে জানতে চাইল, "অরুণাচলে তুমি কী করছ?"

"মুখে বলে কি সব বোঝানো যায় রাধা? পারলে ক'দিন হাতে নিয়ে এসো, সঙ্গে বন্ধুদেরও আনতে পারো। আই উইল প্লে দ্য হোস্ট। আমি এখানে কী করি, কেমন আছি সব দেখেশুনে যাবে। অ্যান্ড অফকোর্স, ডিভোর্সে আমার লিখিত-পড়িত কনসেন্টও নিয়ে যাবে," অশ্রুজিৎ আবার হাসল মনে হল।

রাধা রাগল না। বলল, "আচ্ছা, সে আমি ভেবে তোমায় জানাব। যেটা থেকে ফোন করছ এটাই তোমার সেল নম্বর তো?"

"হ্যাঁ। এই নম্বরেই ফোন কোরো। আপাতত রাখি তা হলে? বাই।"

"বাই।"

রিসিভার নামিয়ে রাধা বহুক্ষণ চুপ করে টেলিফোনের পাশেই বসে রইল। এলোমেলো অনেক কথাই ভাবল। শেষে চারপাশে তাকিয়ে ভাবল, ভাগ্যিস ঋক এই সময়টায় এখানে নেই। এখন নিজেকে আর কারও কাছে দেখাতে ইচ্ছে করছে না।

"তোমাকে তাওয়াং যেতে বলছে? ও নিজে এখানে আসবে না?"

ঋকের প্রশ্ন শুনে নীরবে ঘাড় নাড়ল রাধা।

"কী করবে?"

"কোনও অলটারনেটিভ তো নেই। ওর কাছেই যেতে হবে। গরজটা যখন আমাদের।"

"সেটাও ঠিক। যাও তা হলে।"

"তুমি সঙ্গে যাবে না?"

রাধার কণ্ঠস্বরে উদাস অপরিচিত সুর আবিষ্কার করে অবাক হল ঋক। সামান্য ব্যথাও যেন বুকে বাজল। দেখল, রাধার দৃষ্টিতে শূন্যতা। যেন মন পড়ে আছে আর কোথাও। এখনই কি উড়ে গেল তাওয়াং, অশ্রুজিতের সঙ্গে আগাম দেখা করতে? ঋক রাধার মনের গতি আন্দাজ করতে চেষ্টা করল। খুবই জটিল কোনও খাত ধরে

বইছে নিশ্চয়ই, ভাবল সে। তাই হওয়ার কথা। ছেলেমানুষি প্রেম আর তা থেকে হঠকারী বিয়ে ও মর্মান্তিক বিচ্ছেদের দশ বছর পর আবার দেখা হবে দু'জনের। তাতে এজেন্ডাটা কী? না, ডিভোর্স-বিষয়ক আলোচনা। খুবই জরুরি বিষয়। তবুও পরিস্থিতিটা হাস্যকর। অথচ বেদনাদায়ক। এতদিন পরে দেখা হবে। ছাইয়ের নীচ থেকে পুরনো প্রেমের স্ফুলিঙ্গ একটু-আধটুও কি ঝিলিক দিয়ে উঠবে না? অস্বস্তি হল ঋকের। দুটি মানুষের এই সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে মনে হল, বহিরাগত। রাধার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সে বলল, "আমি সঙ্গে যাওয়াটা কি ঠিক হবে রাধা? এটা তোমার সম্পর্ক। আমার প্রায় কিছুই করার নেই এতে। মনে হয়, তোমাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের সময় সেখানে আমার হাজির থাকা ঠিক না।"

রাধা যেন বলতে হয় বলেই বলেছিল, "তা হলে আমি একাই যাই?"

কথাগুলো আদৌ প্রশ্ন শোনাল না ঋকের কানে। মনে হল, এটাই রাধার সিদ্ধান্ত। এমন সিদ্ধান্ত কেন নিল রাধা? দেখতে গেলে, রাধার একার সিদ্ধান্ত তো নয়, ঋকেরই প্রস্তাব সে মেনে নিয়েছে। তবু যেন কোথায় প্রত্যাশা ছিল রাধা এই প্রস্তাব মেনে নেবে না, চাইবে ঋক তার সঙ্গী হোক। প্রত্যাশা ছিল, রাধা জোর করবে। করল না। আগামী কয়েক দিনের সফরে তার মনের সঙ্গীও হয়তো ঋক নয়। সেখানে জোর খাটাতে চাইলে রাধা ব্যথা পাবে। যন্ত্রণা দু'জনেরই আছে। তফাতও আছে বিস্তর। ক'টা দিন দু'জনের একা পথচলার সময়।

ঋকের সঙ্গে আলোচনা করে অশ্রুজিৎকে ফোন করল রাধা। জানাল, সে অরুণাচল আসতে রাজি, একাই আসবে।

অশ্রুজিৎ বলল, "ওয়েলকাম! অসমের তেজপুর পর্যন্ত প্লেনে আসবে নিশ্চয়ই। কবে, কোন ফ্লাইটে আসছ জানিয়ো।"

দিনক্ষণ স্থির করে রাধা ফের ফোন করল। অশ্রুজিৎ বলল,

"গ্রেট। তোমার জন্যে তেজপুর এয়ারপোর্টে গাড়ি রাখা থাকবে," গাড়ির নম্বর জানিয়ে সে বলল, "মনে রেখো, গাড়ির ড্রাইভার পাসাং শেরিং। খালাসির নাম সাঙ্গে নাওয়াং।"

রাধা অরুণাচল রওনা দেওয়ার আগের দিন সন্ধেয় দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু এল ঋক। রাতের খাওয়া রেস্তরাঁয় সেরে এসে রাধার ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দায় পাশাপাশি বসে দু'জনেই একটি মানুষের কথা ভাবছিল। অশ্রুজিৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই ঋকের। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, রাধার একসময়ের প্রেমিক এবং ঝোঁকের মাথায় বিয়ে-করা স্বামী, এর বেশি কিছু সে জানে না। লোকটা মানুষ হিসেবে কেমন? রাধা কি ওর কাছে নিরাপদ?

"রাধা, তুমি কি কনফিডেন্ট?" ঋক উদ্বেগ চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসল, "আই মিন, তোমাকে একা পেয়ে ও কোনও সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে না তো?"

"কে, অশ্রু?" রাধা অবাক চোখে তাকাল ঋকের দিকে। ঋক নীরবে মাথা নাড়ল। রাধা হেসে ফেলল, "তোমার উৎকণ্ঠা হয়তো অস্বাভাবিক নয়! তুমি তো অশ্রুকে চেনো না। ওর সম্ভ্রমবোধ প্রখর। না, কোনও অন্যায় সুযাগ নেওয়ার চেষ্টা ও করবে না।"

"মানুষের পরিবর্তনও তো হয়," ঋক ভাবুক মুখে বলল, "আজ দশ বছর পরে ও কি সেই একই রকম আছে?"

"এতটা পরিবর্তন কি কারও হয়? জানি না, ঋক।"

ভিতরে একধরনের অস্থিরতা বোধ করল রাধা। চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে সামনের রাস্তা দেখতে-দেখতে বলল, "অশ্রুর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে এই ধরনের ইনসিকিয়োরিটি কখনও ফিল করিনি। কখনও মনে হয়নি যে, ও আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে কোনও কিছুতে জোর করতে পারে। না, কখনও অশ্রু আমাকে ওভাবে অপমান করেনি। আর...," রাধা ঋকের

দিকে ঘুরে বলল, “যদি ও এতটা বদলেও থাকে, তা হলেও চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। দশ বছর চাকরি হয়ে গেল ঋক। কর্মসূত্রে অনেক মানুষ দেখা হল। পুরুষ আমি কিছু কম দেখিনি। ছেলেদের নষ্টামির ওষুধ আমার জানা আছে।”

“সরি রাধা!” ঋক দুঃখিত ভঙ্গিতে বলল, “আমি অশ্রুজিৎ সম্পর্কে খারাপ কোনও কথা বলতে চাইনি। আমি আসলে জাস্ট...”

“জানি ঋক। আমার প্রতি তোমার কনসার্ন থেকেই কথাগুলো তুমি বলছ। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু এক্সপ্লেন এনিথিং। অ্যাপোলজি দেওয়ার দরকার নেই। অশ্রু সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোনও কিছুই বলতে পারা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি ওকে চেনো না। তোমার চিন্তাটা স্বাভাবিক।”

অশ্রুজিৎ সান্যাল নামের মানুষটিকে সে চেনে না। রাধা দ্বিতীয়বার মনে করিয়ে দিল একথা। অদ্ভুত রহস্যময় মনে হচ্ছে সেই অজানা লোকটাকে। ঋক হেসে বলল, “তোমার কথা শুনে মনে হয় না, তুমি ওকে কখনও অপছন্দ করেছ।”

“করিনি ঋক, কখনও অপছন্দ করিনি ওকে। হি ইজ় ভেরি মাচ লাইকেবল। আই নেভার ডিসলাইকড হিম,” রাধা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল।

বুকে তিরতির করে বইতে শুরু করা যন্ত্রণা যেন বেড়ে উঠল। ঋক বলল, “তা হলে তোমাদের মধ্যে গোলমাল কেন হল?”

“সেই একই প্রশ্ন!” রাধা ক্লান্তস্বরে বলল, “তোমাকে তো বলেছি ঋক। আমাদের মধ্যে আলাদা করে কোনও গোলমাল হয়নি। বড় কোনও তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক ভাঙেনি। সেই সময় ঘরসংসার করা বা অশ্রুকে স্বামী হিসেবে সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে হচ্ছিল, অশ্রুর সঙ্গে বিয়ের বাঁধনটা আমার কেরিয়ারের পথে একটা মস্ত বাধা। সব বাধা কাটিয়ে আমি সামনে এগোতে চেয়েছিলাম।”

"আজ আর এগোতে চাও না?"

রাধা কয়েক মুহূর্ত নীরবে ঋককে দেখে বলল, "অবশ্যই চাই। কিন্তু, প্রথম দিকের সেই কঠিন পরিস্থিতি তো এখন নেই। আজ আমার নিজের একটা জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কর্পোরেট জগতে লোকে রাধা রায়কে এখন চেনে। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া?"

রাধা বলল, "তা ছাড়া বয়স হচ্ছে বলেই হয়তো, আজকাল মাঝে-মাঝে একাকিত্ব অসহ্য লাগে। মনে হয়, জীবনে সঙ্গী কেউ একজন থাকলে ভাল।"

"এভাবে কি হয় রাধা?" ঋক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "যখন মনে হল চাই না, তখন ফিরিয়ে দিলাম। আবার যখন মনে হল চাই, তখন ডেকে আনলাম। এভাবে কি ভালবাসা হয়?"

"তা কেন ঋক?" রাধা ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বলল, "তুমি-আমি কেউই প্ল্যান-প্রোগ্রাম ছকে পরস্পরের প্রেমে পড়িনি। চার বছর আগে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছে, তারপর ধীরে-ধীরে বন্ধুত্ব হয়েছে, তারও অনেক পরে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। এর মধ্যে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই?"

"তা নেই," ঋক সায় দিল। বলল, "তবে, তোমাদের প্রেমটা তখন না হয়ে এখন যদি হত, যদি আজ তোমাদের দু'জনের প্রথম আলাপ এবং প্রেম হত, তা হলে হয়তো তোমাদের সম্পর্কটা টিকে যেত।"

"সেসব কথা ভাবা এখন অপ্রাসঙ্গিক," রাধা এই আলোচনায় যবনিকা টানতে চাইল।

ঋক ভাবুক মুখে বলল, "তবু ভাবতে দোষ কী? এখন তুমি অনেক পরিণত, এখন তুমি জীবনে সফল। এখন অনায়াসে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারতে।"

"তখনও আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুলই ছিল। কিন্তু..." রাধা বিরক্ত

হয়ে বলল, "এসব কথা এখন তোমার মনে আসছে কেন? অশ্রুর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে ভেবে তুমি নিজে কি ইনসিকিয়োর্ড ফিল করছ?"

করছে হয়তো। সামান্য বিহ্বল বোধ করছে ঋক। সেই ভাবটা চেপে গিয়ে বলল, "না, তা নয়। আমি ভাবছি, অশ্রুজিৎ তো তেজপুর এয়ারপোর্টে এসেও ডিভোর্সের কাগজপত্র সইসাবুদ করে দিতে পারত। সেক্ষেত্রে তুমিও রিটার্ন ফ্লাইটেই ফিরে আসতে পারতে। তা না করে ও তোমায় আরও দূরে তাওয়াং পর্যন্ত উজিয়ে যেতে বলছে কেন?"

রাধা অস্বস্তিভরে বলল, "ওর কিছু কারণ আছে নিশ্চয়ই। নইলে তো বেঙ্গালুরু বা কলকাতাতেও আসতে পারত। তেমনই তেজপুরে আসতেও অসুবিধে আছে হয়তো।"

"একবার রিকোয়েস্ট করে দেখলে হত? ওকে কি তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"না," জবাব বড় সংক্ষিপ্ত শোনাল নিজেরই কানে। রাধা ইতস্তত করে ফের বলল, যেন ব্যাখ্যা করল, "দ্যাখো, চাইলে অশ্রু এই ব্যাপারটায় আমাকে যথেষ্ট ভোগাতে পারত। তা না করে, এককথায় ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছে, কোনও ওজর-আপত্তি তোলেনি। এর পরেও আমি কোন মুখে ওর উপরে আরও শর্ত চাপাব? কীভাবে বলব, 'অশ্রু, ওখানে নয় এখানে, অমুক জায়গায় আমি যাব না, তুমি তমুক জায়গায় এসো।' "

"কিন্তু রাধা," ঋক বোঝাতে চাইল, "বিষয়টা একতরফা নিজের দিক থেকে কেন দেখছ? অশ্রুজিৎ কি তোমায় কোনও ফেভার করছে? ডিভোর্সটা তো ওরও প্রয়োজন হতে পারে?"

"হতে পারে," রাধা সায় দিয়ে বলল, "হতেই পারে। হওয়াই তো উচিত। কিন্তু ও তো এগিয়ে এসে সেটা চায়নি, চাইছি আমি। সুতরাং..."

"সুতরাং কী, রাধা?" ঋক যেন কিছুটা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল রাধার মুখের দিকে। প্রশ্ন করল, "তোমার মধ্যে কি কোনও অপরাধবোধ কাজ করছে?"

"অপরাধবোধ?" রাধা রুষ্ট ভঙ্গিতে বলে উঠল, "কীসের অপরাধবোধ? আমি কী অন্যায় করেছি?"

ঋক বোঝাল, "না না, আমি তো সেটাই বলছি। তুমি কোনও অন্যায় করোনি। ওই বিয়েটা তো বিয়েই নয়। সে সম্পর্কটা কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, দীর্ঘ দশ বছর যে সম্পর্কের অস্তিত্বই নেই, সেখান থেকে ডিভোর্স তোমার আইনত পাওনা। সেক্ষেত্রে, ডিভোর্সটা আগবাড়িয়ে তুমি চাইছ ভেবে সংকোচবোধ করার কোনও কারণ নেই।"

"জানি না ঋক," রাধা নরম হয়ে বলল, "আমি কি সংকোচবোধ করছি? এতদিন পরে আমার ডাক শুনে ও জবাব দিয়েছে। ডিভোর্সের ব্যাপারে এত সহজে রাজি হয়েছে। ভাবভঙ্গিতে শত্রুতার আভাস নেই, কোনও অভিযোগ নেই। আগাগোড়া বন্ধুর মতো আচরণ করে চলেছে..."

"শত্রুতা কেন করবে?" ঋক সবিস্ময়ে বলল, "তুমিই তো বললে, কোনও তিক্ততা কি কোনও দ্বন্দ্বের কারণে তোমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। তা হলে ওর অভিযোগ কী থাকতে পারে?"

"থাকার কথা নয়, নেইও হয়তো," রাধা ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, "কিন্তু অস্বীকারও তো করতে পারি না যে, এই সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি আমার মর্জিতেই নির্ধারিত হয়েছে। আমার চাওয়াতেই বিয়েটা হয়েছিল, আমারই চাওয়ায় বিচ্ছেদ হল! আজও আবার সেই বিচ্ছেদে আমিই পাকাপাকি আইনের মোহর লাগাতে চাইছি। অশ্রু বরাবরই আমার সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছে। আজও সে আমার শেষ দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েছে।"

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর রাধা বলল, "অশ্রু চাইলে

তিক্ততার সূত্রপাত হতে পারত। যখন ওর সঙ্গে দূরত্ব চাইলাম, ও স্বামী হিসেবে জোর খাটাতে চাইলে অনেক গোলমালই হতে পারত। আমার দাবি মেনে দূরে সরে গেল।"

"নিরুদ্দেশ হয়ে গেল!"

মাথা নাড়ল রাধা, "হ্যাঁ, নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।"

"ও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হতে গেল কেন?"

"জানি না, ঋক। আমারও এটা জানতে ইচ্ছে করে।"

ঋক হেসে বলল, "দুঃখে?"

"দুঃখে কি?" রাধা যেন স্বগতোক্তি করল। পরমুহূর্তেই জিজ্ঞেস করল, "ওর জায়গায় থাকলে তুমি কী করতে ঋক? দুঃখে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে?"

ঋক ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠল, "ব্যথা পেতাম। হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু...," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, সত্যি-সত্যি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারতাম না। কোথায় যাব? বুকে যন্ত্রণা নিয়ে নিজেরই জগতে বাস করতাম।"

"আমিও তা-ই করেছি ঋক, যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নিজেরই জগতে থেকেছি," রাধা আরও বলল, "তারপর দেখা পেয়েছি তোমার।"

"আমিও।" ঋক একদৃষ্টে চেয়ে রইল রাধার দিকে। বলল, "হয়তো তোমাকে চাপ দিতেই নিরুদ্দেশ হয়েছিল ও, যাতে তুমি এই ক্ষেত্রে নিজেকে দায়ী ভাবো, নিজেকে অপরাধী মনে করো।"

"সেক্ষেত্রে, ওর উদ্দেশ্য ভীষণই ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিজেকে দায়ী ভাবি না," ঠান্ডা গলায় ঘোষণা করল রাধা। মুহূর্তখানেক পরে সুর বদলে বলল, "তা হলে মেনে নিতে হয় অশ্রুকে আমি চিনতে পারিনি। ও যে এমন বোকা, এত সেন্টিমেন্টাল তা কখনও বুঝিনি।"

"এ ছাড়া আর কী কারণই-বা থাকতে পারে?"

"জানি না," আনমনে জবাব দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্যালকনি

থেকে শোবার ঘরের দিকে এগোল রাধা। আগামি কাল কাকডাকা ভোরে ফ্লাইট তার। রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠতে হবে। এখনই শুয়ে পড়া দরকার।

ঋক আরও কিছুক্ষণ বসে রইল বারান্দায়। কে এই অশ্রুজিৎ সান্যাল? দশ বছরের অনুপস্থিতির পরেও এখনও রাধার চারপাশে এত তার উপস্থিতি। নাকি ঋকেরই মনের ভুল? মনে-মনে অশ্রুজিৎকে প্রতিদ্বন্দ্বী সে নিজেই ধরে নিয়েছে, সম্পূর্ণ বিনা কারণে। রাধা ডিভোর্স চাইছে। চাইছে ঋককে বিয়ে করবে বলে। তারপরেও তার ভালবাসার আরও কী প্রমাণ প্রয়োজন?

ঋক চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দা থেকে ভিতরে গেল। রাধার ঘরের সামনে এসে দেখল, দরজা খোলা। রাধা ঘুমোয়নি। গায়ে কম্বল জড়িয়ে খাটের একপাশে হেলান দিয়ে বসে ডায়েরিতে কিছু লিখছে। ঋককে দরজার বাইরে দেখে সে ডাকল, "কিছু বলবে? ভিতরে এসো।"

ঋক বাইরে থেকেই বলে উঠল, "আচ্ছা, যদি এমন হত যে, আজ তোমার সামনে আমি আর অশ্রুজিৎ দু'জনেই প্রথমবার একসঙ্গে এসে দাঁড়াতাম, তা হলে কাকে বেছে নিতে?"

প্রশ্ন শুনে রাধা কী যেন ভাবল। সে বলল, "ঠিক ওভাবে আমার দরজার ফ্রেমে তোমরা দুটিতে ছবি হয়ে দাঁড়ালে?"

"না হয় তা-ই।"

রাধা রহস্যময়ীর মতো খিলখিলিয়ে হেসে বলল, "উরেব্বাবা, সে যে এক স্বয়ংবর সভা।"

"বেশ তো, কাকে বাছবে তুমি?"

"যদি জবাব না দিই?"

"প্লিজ়, জবাব দাও।"

"ইচ্ছে করছে না!"

"প্লিজ়!"

রাধা চেয়ে রইল। বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে বসে আছে সে। মুখের একপাশ ঢাকা এলোচুলে। তখনই ঝাঁপিয়ে তাকে ভীষণ ভালবাসা যায়। ঋক শরীর শক্ত করে রুদ্ধশ্বাসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কবল রাধার উত্তরের। প্রার্থনা করল, 'আমার নাম বলো রাধা, মিথ্যে করে হলেও আমারই নাম করো তুমি!'

"আমি তোমাকেই চাইতাম ঋক," শেষে উত্তর এল।

"কেন?"

"এর জবাব হয় না।"

ঋক ভাবল, জবাব না হবে কেন? বেছে নেওয়ার প্রশ্ন যখন আছে, কোনটা বাছলে তার কারণও তো থাকবে? তবু সে আর প্রশ্ন করল না।

রাধা নিজেই কী ভেবে বলল, "তুমি অন্যরকম, ঋক। অশ্রুর মতো নও।"

ঋক তখনও চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে। রাধা তার ডায়েরি ও কলম খাটের একপাশে গুছিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, "বুঝিয়ে বলতে পারব না, ঋক। আর এসব কথা ভাল লাগছে না। আমি এবার ঘুমোব।"

"সরি!" ঋক অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, "সত্যি, তোমাকে রাত থাকতে উঠে পড়তে হবে।"

"শুধু আমি নয়, তুমিও তো উঠবে। আমাকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে যাবে না?"

"অফকোর্স যাব।"

"তা হলে? যাও, তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো।"

"গুড নাইট!" ঋক রাধার ঘরের দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল।

রাধা আলো নিভিয়ে শুল। চোখ বুজে ভাবল, তুমি অন্যরকম ঋক। অশ্রুজিৎ তোমার মতো নয়। তার দুর্বল মুহূর্তে ওভাবে আমার দরজায় সে কখনও এসে দাঁড়াবে না।

জানুয়ারির শীতল সকালে তেজপুর এয়ারপোর্টে চেক-আউট করে লাউঞ্জে এসে থমকে দাঁড়াল রাধা। সামনে তাকিয়ে দেখল, একটা প্ল্যাকার্ড, তাতে ইংরেজিতে লেখা 'মিস রাধা রায়।' বিশ-বাইশের এক পাহাড়ি তরুণ প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। রাধা পায়ে-পায়ে এগোল প্ল্যাকার্ডধারী তরুণের দিকে। তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঠোঁটের উপরে কাইজারি গোঁফ এবং কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলওয়ালা মাথায় টুপি বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের পেটানো চেহারার এক যুবক। সে একমুখ হেসে এগিয়ে এল। মাথার টুপি খুলে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ওয়েলকাম!"

রাধা যেন একটু গুটিয়ে গেল। এতটা চমক প্রত্যাশা করেনি সে। তার আড়ষ্টতা অনুভব করতে পারল কি লোকটা? বিব্রতবোধ করল রাধা। লোকটা হেসে হাত ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি পাসাং শেরিং। গাড়ির ড্রাইভার।" পাশে দাঁড়ানো তরুণকে দেখিয়ে বলল, "ও সাঙ্গে নাওয়াং, আমার হেল্পার। গাড়ি বাইরে আছে। এদিকে।"

রাধার হাত থেকে বড় ব্যাগটি নিজের হাতে নিয়ে যুবক এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনোর রাস্তায় হাঁটতে শুরু করল।

থমকে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল রাধা। সেই প্রথম তার মনে হল, আমি তাওয়াং পর্যন্ত যাব কেন? মনে পড়ল, ঋক বলেছিল, অশ্রুজিৎ তেজপুরে এসে কাগজপত্রে সই করে দিয়ে যেতে পারে না? তার সংবিৎ ফিরল প্ল্যাকার্ড হাতে তরুণের ডাকে। সাঙ্গে নাওয়াং ভদ্র ভঙ্গিতে তাড়া দিল তাকে, "আইয়ে ম্যাডাম, হমলোগ দের হো রহে হ্যায়।"

রাধা দেখল, সামনে পাসাং শেরিং অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। সাঙ্গের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে রাধা মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি শুধু ডিভোর্সের পেপারে অশ্রুর সই নিতে এসেছি? উদ্দেশ্য যদি শুধু তা-ই হত, তবে কাগজপত্র অশ্রুর ঠিকানায় পোস্ট

করে দিলেই কাজ চুকে যেত। জানতে কি ইচ্ছে করে না, অশ্রু কেমন আছে, কী করছে? উচ্চবিত্ত অভিজাত পরিবারের মানুষ, সমাজে নিশ্চিন্ত নিরাপদ পরিধির মধ্যে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজন, কোনও অস্পষ্ট কারণে উত্তরাধিকার এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে অচেনা পরিবেশে কী খুঁজছে? স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না, তবু রাধার ভিতরে আর কোনও রাধা অস্ফুটে বলে, অশ্রুর এই রূপান্তরে তারও ভূমিকা আছে। সে-ও কোনওভাবে দায়ী। সেই মানুষটার জীবন যেখানে হঠাৎ বাঁক নিয়েছিল, সেই উপকূলে সে শুধু দর্শক ছিল না, খাত খোঁড়াতেও তার হাত ছিল। তারপর দুটি পথ চলে গেল দু'দিকে। নিজের পথ আমি নিজে খুঁজে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওর পথ তো ওর সামনেই পড়ে ছিল রাজপথ হয়ে। ও কেন অজানা রাস্তায় নেমে গেল? সে কি আমার জন্যে? নিজের প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নিজেরই কাছে নেই। কেন আমি তাওয়াং যাব? তবু অমোঘ টানে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করল পাসাং শেরিংকে। ড্রাইভারের ব্যবহারটি ভদ্র। ওর বিজাতীয় টুপিটা কিন্তু দিব্যি মানিয়েছে!

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে রাধা তার জন্য নির্দিষ্ট গাড়িটিকে শনাক্ত করল। টেলিফোনে অশ্রুজিতের দেওয়া নম্বর শোনার পর সেটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সামনেই দেখল, সেই নম্বর প্লেট। নম্বর না জানলেও হয়তো একে চিনতে পারত রাধা। আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য বড়-বড় গাডির তুলনায় এই গাড়িটার চেহারা ও চরিত্র চোখে পড়ার মতো। নতুন গাড়ির ভিড়ের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো ঐতিহাসিক এক গাড়ি। গাড়ির কাছে এসে সাঙ্গে নিজের ভাষায় পাসাংকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাগটা তো ছাদে তোলার দরকার নেই। ভিতরে রেখে দিই?"

"রাখ। আজ আর অন্য প্যাসেঞ্জার নেব না," পাসাং বলল।

গাড়ির পিছনের সিটে ব্যাগ গুছিয়ে রেখে সাঙ্গে নিজেও বসল। অন্যদিন সে গাড়ির পিছনের পাদানিতে দাঁড়ায়। ভিতরের সব ক'টি

সিট ভরতি থাকে প্যাসেঞ্জারে। এমনকী, মাঝে-মাঝে এত ভিড় হয় যে, কিছু প্যাসেঞ্জার পাদানিতে সাঙ্গের পাশাপাশি একইভাবে ঝুলতে-ঝুলতে যায়। রাধা বসল গাড়ির সামনের সিটে, পাসাং-এর পাশে। ধীরে-ধীরে জড়তা কাটছিল তার। মনে-মনে স্বীকার করতে আর তত বাধল না যে, শুধু সইসাবুদ সংগ্রহ নয়, অজ্ঞাতবাসে অশ্রুর জীবনযাপন কাছ থেকে দেখার কৌতূহলও তার ষোলোআনা। এক দশক পরে এই সাক্ষাৎ।

নীরবে গাড়ি চালাচ্ছিল পাসাং। গাড়ি কিছুদূর চলার পর নীরবতা ভঙ্গ করবে বলেই যেন রাধা বলে উঠল, "এত পুরনো গাড়ি, কিন্তু মনে হচ্ছে এখনও খুব ভাল কন্ডিশনে আছে?"

"যত্নে থাকে!" পাসাং মন্তব্য করল।

"মাতালের মতো গ্যালন-গ্যালন তেল খায় নিশ্চয়ই?" বলল রাধা।

পাসাং গাড়ি চালাতে-চালাতে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, "তা খায়, সেও আবার সস্তার ডিজেল নয়, দামি পেট্রল। তবে মাতাল নয়। যেসব রাস্তায় চলতে নতুন গাড়ির দম বেরিয়ে যায়, এ সেখানে হাসতে-হাসতে চলে যায়।"

পাসাং-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল বাংলা ও ইংরেজিতে। সাঙ্গের সঙ্গে হিন্দিতে। পাসাং আর সাঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল স্থানীয় কোনও ভাষায়। রাধা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, "অরুণাচলের মানুষের ভাষা কী?"

পাসাং বলল, "কোনও একটা ভাষা তো নয়। অনেকের অনেক ভাষা। অরুণাচলে লোকজন রাস্তাঘাটে ইংরেজি, হিন্দি আর অসমিয়াটাই বেশি বলে।"

"বাঃ!" চলন্ত গাড়ি থেকে বাইরে তাকিয়ে বলল রাধা। মুগ্ধ চোখে দেখছিল রাস্তার ধারে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরে রুপোলি ঢেউ তোলা নদী।

“এটা কী নদী?” সে জানতে চাইল।

“জিয়াভরালি।”

“বাঃ! সুন্দর!”

রাধা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, সাঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও স্থানীয় উপজাতি মানুষ?”

“নিশ্চয়ই,” জবাব দিয়েই পাসাং মুচকি হেসে বলল, “আমি কিন্তু নই।”

রাধা একঝলক পাসাংকে দেখে নিয়ে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, “চেহারা দেখেই যে-কেউ বুঝবে। আর, পরিচিত মানুষকে চিনতে আমার অসুবিধে হয় না।”

তেজপুরে গ্যারাজের মালিকও জিজ্ঞেস করেছিল, “তোমার কিস্‌সাটা কী? মকান-সাকিন কোথায়?”

জবাব না পেয়ে জানতে চেয়েছিল, “উগ্রপন্থী নয় তো? কোথাও ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে আসোনি?”

“না।”

“নামটা কী?”

এর একটা জবাব চাই। যে যেমন মানুষই হোক, ঘরদোর চালচুলো থাকুক না-থাকুক, নাম একটা প্রত্যেকেরই থাকতে হয়। সে বলেছিল, “হরিলাল।”

“হরিলাল কী?”

“চৌধুরী। হরিলাল চৌধুরী।”

গ্যারাজের মাঝবয়সি মালিক সুদাম বড়ুয়া লোক খারাপ নয়। গ্যারাজেই শুতে দিত, দু'বেলা ভরপেট খাবারও দিত। তবে অন্যদিকে হাড়কঞ্জুস। মাইনে দিত নাম-কা-ওয়াস্তে। টেনেটুনে হাতখরচটা হত। তবে, তার হাতে গাড়ির ইঞ্জিন গৃহপালিত পশুর মতো কথা বলে দেখে মালিক কথাবার্তায় রীতিমতো তোয়াজ

করত হরিলালকে। দেখতে-দেখতে মাস কয়েকের মধ্যে সে হয়ে উঠল গ্যারাজের দু'নম্বর মিস্ত্রি।

তবু হরিলালের মন টিকত না। শুধু টাকার কষ্ট নয়। মনে হত, আর কোথাও যাওয়ার আছে। দূরে কোথাও।

তেজপুর-বমডিলা-তাওয়াং রুটের ট্রাভেল এজেন্সির বয়স্ক মালিক শেরিং জাম্বে সুদাম বড়ুয়ার দীর্ঘকালের খদ্দের। মাঝেমধ্যে গ্যারাজে আসতেন। তাঁর এজেন্সির সব গাড়িরই কাজ হত এখানে। নিজেরও গাড়ি নিয়ে কারবার বলেই সম্ভবত, গাড়ির জাদুকর মিস্ত্রি হরিলালকে তিনিও ভালবাসতেন। একদিন জাম্বে বলেছিলেন, "মেরা এজেন্সি মে কাম করেগা?"

খুশিতে হরিলাল বলেছিল, "জু, করুঙ্গা।"

মাসখানেক পরে শেরিং জাম্বের এজেন্সিতে কাজে লেগে গেল হরিলাল। জাম্বের এজেন্সি শুধু পরিবহণের নয়, ট্রেকিং-এরও। অরুণাচলে বেড়াতে আসা পর্যটকরা কেউ ট্রেকিং-এ উৎসাহী হয়ে যোগাযোগ করলে তাঁর সংস্থা তাদের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করে। কিছুদিন শুধু এজেন্সির গাড়ি চালানোর পর হরিলাল মাঝেমধ্যে ট্রেকিং পার্টির সঙ্গে বেরোতে শুরু করল। একদিন তেজপুরে সুদাম বড়ুয়ার গ্যারাজে কাজে এসে সেখানে একপাশে একটা পুরনো ল্যান্ড রোভার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল হরিলাল। কৌতূহলী হয়ে গাড়িটা সম্পর্কে জানতে চাইল। সুদাম জানাল, গাড়ির মালিক বেচে দেবে বলে ওটা গ্যারাজে রেখে গিয়েছে। সুদাম চেষ্টা করছে খদ্দের পেতে। হরিলাল গাড়ির বনেট তুলে তার ইঞ্জিন দেখতে ব্যস্ত হল। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল, "মালিক কত চাইছে?"

"কেন, তুই কিনবি?" সুদাম জানতে চাইল।

"আমি কিনি কি আর কেউ, তুমি দামটা বলো না।"

"তুই কিনলে এক দাম বলব, অন্য কেউ হলে আর-এক," সুদাম একগাল হেসে জানাল।

হরিলালও হেসে ফেলল, "তোমায় আমি চিনি না? পচা লোহার কুচিটি পর্যন্ত পাইপয়সার হিসেবে বিক্রি করো।"

"আমাকে তুই এত খারাপ ভাবিস না। তুই আমার পুরনো লোক। সত্যি বলছি, যদি কিনিস তো সস্তায় ছেড়ে দেব।"

"ঠিক আছে, আমি কিনব। দাম বলো।"

সুদাম যে দাম বলল, হরিলাল তাতে অন্যায্য কিছু দেখল না। সস্তাতেই দিতে চাইছে। সে তখনই কিছু টাকা ধরিয়ে দিল সুদামের হাতে, "এটা অ্যাডভান্স। বুক করে রাখলাম। ওই গাড়ি আমার। হপ্তাখানেক পরে বাকিটা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাব।"

তাওয়াং ফেরার পথে সারাটা রাস্তা ভাবতে-ভাবতে এল হরিলাল। তার মোট সঞ্চয় যা আছে, তার পরেও আরও হাজার বিশেক টাকা কম পড়ছে। তাওয়াং পৌঁছে ব্যাপারটা শেরিং জাম্বেকে জানাল সে।

"স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করতে চাস?" জাম্বে জানতে চাইলেন।

হরিলাল নীরবে ঘাড় নাড়ল।

"আমি তোকে পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারব না।" রাখঢাক না করে খোলাখুলি জানালেন জাম্বে।

মুখ কালো হয়ে গেল হরিলালের। সে মৃদুস্বরে বলল, "আমি আপনার কাছে ধার চাইছিলাম, সুদও দিতাম।"

"আমি কাউকে ধার দিই না। যদি-বা দিতাম, তোর কাছে সুদ নিতাম না।"

হরিলাল বুঝল, তার গাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন পূর্ণ হবে না। হতাশ হয়ে জাম্বের অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জাম্বে তাকে ডাকলেন, "শোন, তুই যখন সুদে ধার নিতে তৈরি, তা হলে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নে।"

হরিলাল মাথা নাড়ল, "ব্যাঙ্ক টাকা দেবে না। একে পুরনো গাড়ি, তাতে এখানে আমার স্থায়ী ঠাঁইঠিকানা নেই।"

"দেবে।, জাম্বে প্রত্যয়ী স্বরে বললেন, "আমি তোর গ্যারান্টার হব। যা, অ্যাপ্লিকেশন কর।"

ব্যাঙ্কে জাম্বের পরিচিতির জোরে হরিলালের পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়ে গেল। গাড়ির দামে হরিলালের ঘাটতি ছিল হাজার বিশেকের। জাম্বেই পরামর্শ দিলেন, "আরও তিরিশ হাতে রাখ। ব্যাবসা শুরু করতে খরচ আছে। তা ছাড়া, গাড়িটার পিছনে প্রথমে তো তোকে বেশ কিছু ঢালতে হবে?"

কথা ভুল নয়। হরিলাল স্বাধীন ব্যবসায় নামাল। হরিলালের হাতের গুণে পুরনো ল্যান্ড রোভারের হাল বদলে গেল। সুদাম বড়ুয়ার গ্যারাজেই নিজের হাতে গাড়ির কাজ করল হরিলাল। সপ্তাহ দুয়েক গাড়ির পিছনে ভূতের মতো খাটার পর সেই গাড়ি নিয়ে যখন তাওয়াং রওনা দেবে, তখন সুদাম বেজার মুখে বলল, "এমন জানলে তোকে দিয়ে গাড়ির কাজ করিয়ে নিয়ে আর কাউকে অনেক বেশি দামে বেচতে পারতাম।"

হরিলাল হেসে বলল, "সুযোগ ফসকে গিয়েছে, এখন আর কপাল চাপড়ে কী লাভ?"

"নাঃ, কোনও লাভ নাই। বরং তোকে তেল মারাই ভাল। শোন, একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে গাড়ি হবে তোর। গাড়ির কাজ কিন্তু এখানেই করাস। অন্য কোথাও যাস না।"

হরিলাল মাথা ঝুঁকিয়ে মেনে নিল, "যাব না। তোমার গ্যারাজেই আসব।"

ঘণ্টাদুই একটানা চলার পর অসম-অরুণাচল সীমান্তে ভালুকপং-এ গাড়ি থামাল পাসাং। এখানে চেকপোস্টে বহিরাগতদের ইনার লাইন পারমিট দেখে তবে অরুণাচলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। ঋক দিল্লিতে অরুণাচল সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনারের অফিস থেকে রাধার পারমিট করিয়ে এনেছিল। এখানে

চেকপোস্টে সেটা দেখাতেই দু'-চার কথা জিজ্ঞেস করে রাধাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

সামান্য চা-জল খেয়ে আবার সকলে গাড়িতে উঠে রওনা হল। আশপাশে জঙ্গল দেখে রাধা জানতে চাইল, "এই জঙ্গলে নিশ্চয়ই অনেক ভালুক আছে?"

"তা থাকতে পারে এক-আধটা। আমি কখনও দেখিনি।" বলল পাসাং।

"তা হলে এখন আর নেই হয়তো," রাধা বলল, "সেই ইকোলজিক্যাল প্রবলেম। বনজঙ্গল কাটাকাটি, দূষণ, মানুষের দাপটে সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তবে একসময় অনেক ছিল নিশ্চয়ই। জায়গাটার নামেই বোঝা যায়, ভালুকপং!"

পাসাং স্থানীয় ভাষায় কিছু বলল সাঙ্গেকে। সাঙ্গে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। হাসি থামতে সে হিন্দিতে বোঝাল, "পং মানে 'সুরক্ষিত জায়গা', রাজাগজাদের প্রাসাদ বা কেল্লা যেমন হয় আর কী। বুড়োদের কাছে গল্প শুনেছি, সেই কবে অনেক আগে এই জায়গাটা এক শক্তিমান রাজার রাজধানী ছিল। রাজার নাম ছিল ভালুক। তা থেকে জায়গার নাম হয়েছে ভালুকপং।"

"ও!" রাধা বলল, "মানুষ-রাজার নাম ভালুক?"

"হ্যাঁ," ঘাড় নাড়ল সাঙ্গে, "মানুষই। ভালুক-রাজা নয়।"

"বোঝো!" আনমনে মাথা নাড়ল রাধা। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওঁর কোনও বংশধর নেই এখন? কোনও উত্তরাধিকারী?"

রাধার প্রশ্নটা সাঙ্গে বুঝল না হয়তো। সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

পাসাং বলল, "কার? রাজা ভালুকের?"

"হ্যাঁ।"

পাসাং কয়েক মুহূর্ত কিছু ভাবল। বলল, "বংশ আর উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। আমি যদি বলি, আমি

এই পৃথিবীর রাজা, লোকে মানবে না। তবুও আমি ভাবব আমি রাজা। এই বনজঙ্গল, পাহাড়, নদী, এই চাঁদ, সূর্য, তারা, এই সবেই আমার উত্তরাধিকার।"

রাধা হেসে বলল, "খুবই দার্শনিক কথা।"

"দর্শন ছাড়া কী?" পাসাং জবাব দিল, "প্রমাণ তো কোথাও কিছু নেই। লিখে রাখা ইতিহাস নেই। এই অঞ্চলের বাসিন্দা উপজাতি হল আকা। তারা সগর্বে দাবি করে যে, তারা রাজা ভালুকের বংশধর। সেই দাবি মেনে নিলে রাজার বংশ রইল, উত্তরাধিকারও চলমান। নইলে কিছুই নেই। কী যায়-আসে তাতে!"

কিছুই কি যায়-আসে না? তা হলে আকারা রাজা ভালুকের কথা এখনও মনে রেখেছে কেন? কিছুই তো দিতে পারে না সে এখন।

"অরুণাচলে সমস্ত উপজাতিই রাজকীয় ঐতিহ্য দাবি করে।" পাসাং বলে চলল, "ছোট-ছোট পাহাড়ি গোষ্ঠী, একে অপরের থেকে দূরে-দূরে বাস। এখনও পাহাড়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল নয়। সেই প্রাচীন যুগে এই সমস্যা নিশ্চয়ই আরও বেশি ছিল।"

"হয়তো," মেনে নিল রাধা।

"অরুণাচলে ক'দিন কাটালে বোঝা যায় এদের আচরণে চাপা রাজকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এরা গরিব, কিন্তু ভদ্র এবং অভিজাত। অপরিচিত বিদেশির প্রতি সৌজন্য প্রকাশে কার্পণ্য নেই। কিন্তু একই সঙ্গে সম্ভ্রমভরা দূরত্ব রেখে চলে। আর সমতলের মানুষের অভিসন্ধি সম্পর্কে একটু সন্দেহও অবশ্য আছে। বিদেশিরা অনেকেই তো চালাকি আর বুদ্ধির প্রভেদ করে না। এরা তাদের অপছন্দ করে। পাত্তা দেয় না। বাইরে থেকে দেখে লোকে ভাববে চালচুলোহীন, সে মনে-মনে নিজেকে রাজা ভাববে।"

হঠাৎ এসব কথা? পাসাং-এর বক্তব্য তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল রাধা।

পিছনে বসে থাকা সাঙ্গে পাসাংকে ডেকে কিছু একটা বলল।

রাধা প্রথম থেকেই খেয়াল করেছিল সাঙ্গে পাসাংকে একটা অদ্ভুত অপরিচিত নামে ডাকছে। সে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সাঙ্গে অন্য একটা কী নামে ডাকছে?"

"ঠিক নাম না। ও আমাকে ডাকে আতেবো, মানে জামাইবাবু।"

"জামাইবাবু!" রাধা অবাক হয়ে বলল, "মানে সাঙ্গে...?"

"আমার স্ত্রীর ভাই কিনা?"

"তাই তো দাঁড়ায়, নাকি?"

"তাই কি? ঠিক তা বোধহয় নয়," রাধার প্রশ্নের জবাব দিয়ে পাসাং হেসে স্থানীয় ভাষায় সাঙ্গেকে কিছু বলল। সাঙ্গে হেসে উঠল।

রাধা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক তা হলে কী?"

পাসাং নরম গলায় জবাব দিল, "সাঙ্গে আমাকে গ্রাম-সম্পর্কে জামাইবাবু বলে ডাকে। তবে সেটাও ঠিক কিনা আমি জানি না। সাঙ্গে, ম্যাডামকে তোদের গাঁওবুড়ার কথাটা শুনিয়ে দে।"

সাঙ্গে তার ভাষায় বলে গেল অনেক কিছু। রাধা বিন্দুবিসর্গও বুঝল না সেই ভাষা। পাসাংকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে ব্যাপারটা খোলসা করে দিল না তার কাছে।

রাধা বুঝল বিষয়টার মধ্যে কোথাও কিছু ধাঁধা আছে, এবং সেটা পাসাং পরিষ্কার করতে চায় না। প্রসঙ্গ বদলাতে সে সামনে নদী দেখে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী নদী?"

"কামেং," জবাব দিল পাসাং।

"কামেং, তখন রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডে এই জেলাটারও নাম যেন দেখলাম কামেং?"

"ঠিকই। নদীর নামেই জেলার নাম।"

"ওঃ! যেমন হুগলি নদীর নামে আমাদের জেলার নাম হুগলি।"

"এই নদী আগেও দেখেছি আমরা।"

"কোথায়?"

"এই তো কিছুক্ষণ আগে। ভালুকপং-এ চেকপোস্ট পেরোনোর আগে," পাসাং বলল, "অসমে যে নদীর নাম ছিল জিয়াভরালি, অরুণাচলে তাকেই লোকে বলে কামেং।"

হরিলাল ট্রান্সপোর্ট-এর সঙ্গে যুক্ত করেছিল ট্রেক। তেজপুর থেকে গাড়িতে যাত্রী তুলত। পর্যটক দল ট্রেকিং-এ আগ্রহী হলে তাদের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিত। বছরপাঁচেক আগে একবার একদল ট্রেকারকে নিয়ে গিয়েছিল থেমবাং-তাওয়াং ট্রেক রুটে। ট্রেকের শেষ পর্যায়ে সেলা পাস থেকে তাওয়াং-এর পথে ছাংবু গ্রামে রাতে বিশ্রাম ও ভোজনের জন্য থামতে হয়েছিল। ছাংবু গ্রামে হরিলালের যে বাড়ির সঙ্গে চুক্তি, তার মালকিন বছর সাতাশ-আঠাশের ইয়াংকি দ্রেমা বিধবা যুবতী, একটি সন্তানের মা। শেরিং জাম্বের এজেন্সির চুক্তিও এই বাড়ির সঙ্গে। ফলে জাম্বের সংস্থায় কাজ করার সময় থেকেই হরিলাল ইয়াংকিকে চেনে। তার বাবা পঙ্গু, মায়েরও বয়স হচ্ছে। চোদ্দো থেকে সতেরো বছরের তিনটি ভাইবোন আছে। সামান্য জমিজমা তাদের। জমির ফসল যা ঘরে ওঠে তাতে সারা বছর সকলের খেয়েপরে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য ব্যাপার। গোয়ালে কয়েকটি মিথুন গাই-বাছুর, দুটি-চারটি ভেড়াও আছে। তাদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। ভেবেচিন্তে ইয়াংকি বাড়ির সামনেটায় ছোট মুদি দোকান খুলল। কিন্তু গ্রামে মানুষও কম, তাদের কেনার ক্ষমতাও কম। দোকান চলতে থাকল টিমটিম করে। তখনই তার মাথায় অন্য বুদ্ধি এল। ভাবনাচিন্তা করে ইয়াংকি কয়েকজন গাইডকে প্রস্তাব দিল যে, তারা মাঝেমধ্যে এই গ্রামে তার বাড়িতে ট্রেকারদের এনে তুলুক। গাইডরা রাজি হয়ে গেল। ইয়াংকির দস্তুরমতো নামডাকও হল।

একবার একজন লোক মদ খেতে-খেতে ইয়াংকির সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেছিল। হরিলাল দূরে বসে মনে-মনে প্রমাদ গনল, গোলমাল যদি বাধে, গাইড হিসেবে তারও কিছু দায়িত্ব থাকবে। যখন সত্যি গোলমাল শুরু হল, তখন হরিলাল ইয়াংকিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল।

ইয়াংকি কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, "ধন্যবাদ। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে।"

"আর ওই লোকটাকেও," বলল হরিলাল।

"কী আর করা যাবে? ব্যাবসাটাও তো রাখতে হবে।"

"তাও ঠিক। তোমার একার নয়, ব্যাবসা তো আমারও।" হরিলাল সায় দিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোল।

"কোথায় শোবে?"

"বাইরের ঘরে, যেখানে সবাই শুয়ে আছে।"

"আজ ওখানে শুতে হবে না। রান্নাঘরে একপাশে তোমার জিনিসপত্র রেখে দিয়েছি। একটু হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারবে। ঠান্ডাটাও ওখানে একটু কম। এসো।"

হরিলাল অবাক চোখে দেখল ইয়াংকিকে। বিছানায় বসে রুকস্যাকের পকেট হাতড়াল হরিলাল। ইয়াংকি মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। জিজ্ঞেস করল, "কী?"

হরিলাল ইঙ্গিতে দেখাল, দারুর বোতল।

"দাঁড়াও," ইয়াংকি মোমবাতি হাতে চলে গেল। ফিরে এল কয়েক মুহূর্ত পরেই। হাতে একটা ভরতি বোতল। হরিলাল অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বোতলটা হাতে নিয়ে গলায় ঢালল এক ঢোক।

"দাও। একটু খাই," ইয়াংকি বিছানার একপাশে বসে পড়ে বোতলটা নিল। তাতে এক চুমুক দিয়ে ফিরিয়ে দিল হরিলালের হাতে। বলল, "তুমি ভাল মানুষ, হরিলাল। এত পুরুষ আমাকে চায়, তুমি কেন চাও না হরিলাল?"

দু'হাতে ইয়াংকিকে জড়িয়ে ধরল সে। হাত বাড়িয়ে মোমবাতি মুখের কাছে এনে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল ইয়াংকি।

পরে একদিন ইয়াংকি জিজ্ঞেস করল, "আমায় বিয়ে করবে হরিলাল?" হরিলালের কাছ থেকে জবাব এল না দেখে সে বলল, "মন না চাইলে কোরো না।"

হরিলাল তাকে বলল, "আজ হঠাৎ কেন এ কথা জানতে চাইছ?"

হরিলাল আন্দাজ করেছিল ইয়াংকির সমস্যা। সে চিন্তিত হয়ে উঠল। কিছুদিন ভেবে শেষে মনস্থির করে জানাল, "আমি বিয়ে করব।"

"কিন্তু তা হলে তোমার ধর্ম বদলাতে হবে যে। পারবে?" ইয়াংকি তার বুকের কাছে ঘেঁষে জানতে চাইল।

সে বলল, "পারব।"

বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হল হরিলাল। শেরিং জাম্বে বললেন, "তুই আজ থেকে আমার ধর্মপুত্র হলি। আমার নাম তোকে দিলাম।"

নতুন জীবনে হরিলালের নতুন নাম হল পাসাং শেরিং। সাঙ্গে নাওয়াং-এর মতো ইয়াংকির প্রতিবেশী আরও অনেক ছেলে-ছোকরাই তাকে ডাকতে শুরু করল "আতেবো।"

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ গাড়ি ঢুকল বমডিলা শহরে, প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টার পর। একে জানুয়ারি মাস, তাতে রাস্তাতেই আকাশে মেঘ ঘনিয়ে উঠে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টি এখনও হয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে, শহরের হাড়-কাঁপানো শীত। রাধা ইতিমধ্যে গরম জামা বের করে গায়ে জড়িয়েছিল। তাতেও শীত কাটে না। আজকের রাতটা বমডিলায় থাকতে হবে। আগামী কাল সকালে আবার পাসাং-এর গাড়িতে তাওয়াং রওনা হতে হবে। পাসাং যে হোটেলে

নিয়ে গিয়ে তুলল, সেটা ভালই মনে হল রাধার। পাসাং জানাল, ওটাই নাকি শহরের সেরা হোটেল এবং এখানে আগে থেকেই তার জন্য ঘর নিয়ে রাখা হয়েছে।

রাতে ঘুম আসছিল না রাধার। মনে হচ্ছিল অদ্ভুত এক যাত্রাপথের মাঝখানটিতে আছে সে। কী আছে এর শেষে? শেষ দেখা কি জরুরি? এখনও ফিরে যাওয়া যায়। আগামীকাল বমডিলা থেকে তেজপুরের গাড়ি ধরা যায়। করা যায় অনেক কিছুই, যা নিশ্চিত, যা নিরাপদ। অথচ মন ছুটে চলেছে কুয়াশায় ভরা একটাই পথে। তাওয়াং পৌঁছে কি এই অভিযান শেষ হবে? সে তো আগামীকাল। অবাধ্য মন চাইছে যাত্রা দীর্ঘ হোক। পথের শেষে আর কোনও প্রত্যাশা প্রতীক্ষা করে নেই। আছে নিশ্চিত ধ্বংস। গত দশ বছরে নিজেরই অজান্তে অনাদরে বেঁচে থাকা এক সম্পর্কের মৃত্যু। মৃত্যু চাইতেই আসা। তবু, আর সকলের মতো তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে-ও অবুঝের মতো বাঁচতে চাইছে। অন্তত আরও কিছুক্ষণ।

সকাল আটটায় ঘুম যখন ভাঙল, তখন আর বৃষ্টি নেই। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কারও নয়। দেরি হল ঘুম ভাঙতে। কথা ছিল সকাল সাতটায় বমডিলা থেকে রওনা দেওয়া হবে। রাধা হোটেলের রিসেপশনে ফোন করে জানল পাসাং আর সাঙ্গে গাড়ি নিয়ে হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা রাত কাটিয়েছিল নীচে বাজারে তাদের পরিচিত এক সস্তার হোটেলে। যথারীতি সকাল সাতটায় গাড়ি নিয়ে রাধার হোটেলে হাজির হয়েছিল। রাধা হোটেল থেকে যখন বেরোল তখন ন'টা বেজে গিয়েছে। দেরি হওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে সে জানতে চাইল, এর ফলে তাওয়াং পৌঁছোতে খুব রাত হয়ে যাবে কিনা? পাসাং জানাল, এমন কিছু দেরি হবে না। সকাল সাতটায় বেরোলে বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছোনো যেত। এক্ষেত্রে হয়তো একটু সন্ধে হয়ে যাবে। তাতে অসুবিধে কিছু নেই। ওখানেও হোটেলে বুক করা আছে।

গাড়ি স্টার্ট করে পাসাং বলল, "গতকাল সন্ধেয় বমডিলার বাজার থেকে আমরা একটা জিনিস জোগাড় করেছি। সাঙ্গে, জিনিসটা ওঁকে দে।"

পিছের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে সাঙ্গে একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল রাধার দিকে। রাধা প্যাকেট খুলে অবাক হয়ে গেল। একটা হাতে-বোনা সুন্দর রঙিন স্কার্ফ। পাসাং বলল, "এই ধরনের স্কার্ফ ব্যবহার করে এখানকার মনপা মেয়েরা।"

রাধার মনে পড়ল, গতকাল পথে পাসাং-এর টুপির প্রশংসা করেছিল সে, খানিকটা ঠাট্টার ছলে। পাসাং সেটা মনে রেখেছে। পাসাং-এর মাথার টুপিটা হাতে-বোনা কাপড়ে তৈরি। গড়ন অনেকটা গল্‌ফ-ক্যাপের মতো। টুপির পিছনে কোনও পাখির রঙিন পালক তেরচাভাবে বসানো। টুপিটায় পাসাংকে মানায় বেশ। পাসাং তখনই জানিয়েছিল, "এই ধরনের টুপি পরে এখানকার মনপা ছেলেরা।"

রাধা পার্স বের করতে-করতে বলল, "ধন্যবাদ, কত দাম নিয়েছে এটার?"

পাসাং-এর কাছ থেকে জবাব এল না। মুখ রীতিমতো গম্ভীর দেখাল তার। সাঙ্গে বলল, "টাকা রাখুন। এটা আমার আর আতেবোর তরফে আপনাকে উপহার। এখানকার একটা জিনিস আপনার ভাল লেগেছে দেখে আমরা খুশি হয়েছি।"

রাধা বারকয় ধন্যবাদ জানিয়ে পার্স ঢুকিয়ে রাখল। পাসাং-এর মুখ থেকে মেঘ সরল যেন। সে রাস্তার একটা কঠিন বাঁক সাবধানে পেরিয়ে গিয়ার বদলে বলল, "সমস্ত কিছুর প্রতিদান হয় না ম্যাডাম। কখনও ইচ্ছে হলে আমাদের কিছু উপহার দেবেন। আমরা ফিরিয়ে দেব না।"

রাধা জবাব দিল না। পাসাং বলে উঠল, "খুশি হলে একটুকরো হাসি দেবেন। আমরা চিরটাকাল আপনার হাসি মনে রাখব, কী বলিস, সাঙ্গে?"

সাঙ্গে আগের বাংলা কথোপকথনের মর্মোদ্ধার করতে পারেনি। সে পিছন থেকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "কী আতেবো?"

পাসাং ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বলল, "তুই বুঝবি না। তোর বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম।"

অপ্রস্তুত বোধ করল রাধা। খানিকটা অপমানিতও। ড্রাইভার-খালাসি হলেই কি স্বভাবে চোয়াড়ে হতে হয়? দু'-চার কথা ফিরিয়ে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছে দমন করতে-করতে সে একমনে চেয়ে রইল গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে।

ঘণ্টা দুই চলার পর চা-জল খেতে গাড়ি থামাল পাসাং। বলল, "জায়গাটার নাম দিরাং।"

চা-দোকানের সামনে রুকস্যাক কাঁধে একদল মানুষকে দেখে রাধা জানতে চাইল, "ওরা কারা?"

পাসাং বলল, "ওরা ট্রেকার। পায়ে হেঁটে তাওয়াং যাবে।"

"বাঃ! আমরাও তো ট্রেক করে যেতে পারতাম!" বলে উঠল রাধা।

পাসাং বলল, "কম করে চার দিন লাগবে। এটা অনেক বেশি উচ্চতার ট্রেক। অভ্যেস লাগে। তা ছাড়া, আগে থেকে তৈরি না হয়ে হুট করে ট্রেক শুরু করা যায় না।"

"পুরোটা না হলেও অন্তত কিছুটা রাস্তা যদি ট্রেক করে যাওয়া যেত?" রাধা দমতে চাইল না।

পাসাং বলল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে! প্রায় চোদ্দো হাজার ফুট উঁচুতে সেলা টপ পর্যন্ত রাস্তা পুরোটাই চড়াই। ওইটুকু গাড়িতে গিয়ে তারপর না হয় কিছুটা রাস্তা হাঁটা যাবে।"

আরও ঘণ্টাদুয়েক পাকদণ্ডী পথে চড়াই ভাঙার পর সেঙ্গে নামে এক গ্রামে গাড়ি থামল। পাসাং বলল, "একটা বেজে গিয়েছে। দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেওয়া যাক।"

খাবার বলতে সেখানে পাওয়া যায় ভাত, ডাল, তরকারি এবং মাংসের পদ। "কী মাংস?" সাঙ্গেকে জিজ্ঞেস করল রাধা।

সাঙ্গে বলল, "জো আপ মাঙ্গেগি, মুর্গা, শুয়োর!"

"শুয়োর?"

রাধাকে চমকে উঠতে দেখে সাঙ্গে থমকে ইতস্তত করতে শুরু করল। পাসাং হেসে বলল, "মানে পর্ক।"

"সে বুঝেছি," রাধা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি পর্ক খাই না," একটু থেমে যোগ করল, "পর্ক যেখানে-সেখানে খাওয়া উচিতও নয়।"

সাঙ্গে জানাল, "এখানে ভেড়ার মাংসও পাওয়া যায়, গোরুর মাংসও।"

রাধা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল পাসাং-এর দিকে।

পাসাং তাকে শান্ত করতেই প্রায় ক্ষমাপ্রার্থী ভঙ্গিতে নরম গলায় বলল, "মুরগি, মানে চিকেনই হোক তা হলে?"

রাধা বলল, "মাংস খেতে আজ ইচ্ছে করছে না। আলুভাজা পাওয়া যাবে কি?"

"নিশ্চয়ই। একটু অপেক্ষা করতে হবে হয়তো। আমি ভাজতে বলে দিচ্ছি।"

যথাসময়ে আলু, বিনস ইত্যাদি একসঙ্গে ভাজা হয়ে খাওয়ার টেবিলে হাজির হল। পাসাং ও সাঙ্গে অবশ্য মাংসই খেল। রাধা জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী?"

"হ্যাঁ, এটা পর্ক," পাসাং জবাব দিল।

"এখানে ধর্মের কোনও নিষেধ নেই, তাই না?" রাধা সাঙ্গের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, "তোমরা দু'জনে কি ধর্মের অনুশাসন মানো?"

সাঙ্গে কিছু বলার আগেই পাসাং বলে উঠল, "আমাদের মতো অনেকেই সব খায়। মুরগি, শুয়োর, গোরু, ভেড়া সব। ছুঁতমার্গ একেবারেই নেই।"

"ও," রাধা আর কথা বাড়াল না। ডাল, আলুভাজা আর

তরকারি, তবু যেন কেমন শুয়োর-শুয়োর গন্ধ। কোনওমতে কয়েক গ্রাস খেয়ে সে উঠে পড়ল। পাসাং গম্ভীর গলায় সাঙ্গেকে বলল, "ওঁকে ওসব শুয়োরের কথা না বললেই পারতিস।"

সাঙ্গে অবাক হয়ে জবাব দিল, "বাঃ! শুয়োরে ওঁর এত ঘেন্না সে আমি কীভাবে জানব?"

পাসাং বলল, "রেস্তরাঁর ওয়েটারের মতো গোরু, শুয়োর এসবের ফিরিস্তি দিতে তোকে কে বলেছিল?"

সাঙ্গে অভিমানী গলায় বলল, "ঠিক আছে, আমি আর একটা কথাও বলব না।"

পাসাং বোঝাল, "তা নয়। দেখলি না, ওঁর খাওয়াটাই হল না?"

সাঙ্গে মুখ তুলে পাসাংকে দেখতে-দেখতে বলল, "সরি আতেবো। আমি জানতাম না।"

পাসাং একটু নরম হয়ে বলল, "তাও ঠিক। তুই কীভাবেই বা জানবি? ঠিক আছে, খা।"

সেঙ্গে থেকে বেলা দুটো নাগাদ গাড়ি ছেড়ে আধঘণ্টাটাক যাওয়ার পরে গাড়ি বিগড়ে গেল। রাধা ঠাট্টা করে বলল, "বুড়ো গাড়ি!"

পাসাং চিন্তিত মুখে বলল, "এমন কিন্তু হয় না। আজ হয়ে গেল। আসলে বুড়ো নয়, যন্ত্র তো, হতেই পারে।"

বলল বটে, কিন্তু ইঞ্জিন দেখে সে বুঝেছিল গোলমাল রীতিমতো গোলমেলে। সারাতে সময় লাগবে। তার মধ্যে কখন পাহাড়ে আবহাওয়া খারাপ হবে, কখন হুট করে মেঘ, বৃষ্টি আর কুয়াশায় ঝেঁপে অন্ধকার নামবে, তা বলা যায় না; পাহাড়ি পরিবেশে অনভ্যস্ত মহিলাকে তার আগে তাওয়াং রওনা করিয়ে দেওয়া ভাল। পাসাং ভাবল, পথচলতি কোনও গাড়িতে জায়গা পেলে তার গাড়ির প্যাসেঞ্জারকে তাতে তুলে দেবে। সাঙ্গেও সঙ্গে যাবে।

গাড়ি সারানো হলে পাসাং পরে আসবে। রাধাকে সেই প্রস্তাব দিতে রাধা রাজি হল না। পরে বোঝা গেল, রাজি হলেও উপায় হত না। রাস্তায় চলতি গাড়ির সংখ্যা বেশি নয়। গাড়ি সারাতে যে ঘণ্টাদেড়েক লাগল, সেই সময়টুকুতে মাত্র তিনটি জিপ পেরিয়ে যেতে দেখা গেল, সেও ছাদে-বাম্পারে যাত্রী বোঝাই হয়ে। বিকেল চারটে নাগাদ গাড়ি সারিয়ে চারপাশে তাকিয়ে পাসাং চিন্তিত হয়ে উঠল। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। হাওয়ার জোরও বাড়ছে। আধঘণ্টাটাক পরেই ঝপ করে সন্ধে নামবে। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে বরফ পড়তে শুরু হলে অন্ধকারে এই রাস্তায় গাড়ি চালানো দুঃসাধ্য শুধু নয়, বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। আজ কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না সে। সেক্ষেত্রে আজ তাওয়াং পৌঁছোনো অসম্ভব। অথচ, পথে হোটেলটোটেলও কিছু নেই। এদিকে সঙ্গে এক মহিলা। তাঁকে নিয়ে কোথায় যাবে পাসাং? রাতে কোথায় তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করবে? ভাবতে-ভাবতেই গাড়ি চালু করল সে। রাধার ভাবভঙ্গিতে অবশ্য দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ নেই। তাওয়াং পৌঁছোনোর তাড়াও নেই যেন। পাসাং যতক্ষণ গাড়ি সারাচ্ছিল, সে আশপাশের দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছিল। মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছিল গাড়ির কাজ। উদ্বেগের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল পাসাং-এর। চালকের উপরে যাত্রীর ভরসা এখনও ষোলোআনা। কিন্তু ম্যাডাম, প্রকৃতির মর্জি তো জানে না। সে খেপে উঠলে তখন কে পাসাং আর কোথায় তার যাবতীয় এলেম। সমুদ্র থেকে চোদ্দো হাজার ফুট উঁচুতে কেউ কিছু নয়, পিঁপড়ে, পিঁপড়ে। সেলার চূড়ায় যখন পৌঁছোল তারা, তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। চারপাশে তখনই সন্ধের অন্ধকার। প্রায় ঝড়ের গতিতে বরফের মতো ঠান্ডা বাতাস বইছে। ঝিপঝিপ শব্দে হাল্‌কা বরফও পড়তে শুরু করেছে। গাড়িতে জড়সড় হয়ে এলিয়ে বসে আছে রাধা। থেকে-থেকেই কেঁপে উঠছে মনে হচ্ছে। পাসাং উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? ঠান্ডা লাগছে?"

রাধা জবাব দিল না। শুধু হাত তুলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল পাসাংকে। কিছুক্ষণ ধরেই তার ভীষণ শীতবোধ হতে শুরু করেছে। শরীরে রীতিমতো কাঁপুনি ধরেছে এখন। ব্যাগ থেকে যাবতীয় গরম পোশাক বের করে পরে নিল সে। সমস্ত গায়ে চড়িয়েও ঠান্ডা যেন কিছুতেই কাটে না। পাসাং হাত বাড়িয়ে নিজের আপাং-এর বোতলটা ধরিয়ে দিল রাধার হাতে, "ওষুধের মতো একটু খেলে ক্ষতি নেই। আরাম লাগবে।"

বোতলে চুমুক দিতে গিয়ে দেশি মদের গন্ধে বমি এসে গেল রাধার। সে সশব্দে শুকনো ওয়াক তুলল, "পারব না।" ঠকঠকিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বোতলটা ফেরত দিয়ে দিল পাসাংকে।

পাসাং আফশোস করে বলে উঠল, "মুশকিল হল তা হলে! সঙ্গে অন্যকিছু আছে?"

রাধা একটু ভেবে জবাব দিল, "আছে?"

"কী?"

"হুইস্কি।"

"হুইস্কি!" পাসাং হেসে ফেলল। বলল, "তা হলে ওটা এক ঢোক খেলেও তো উপকার হয়!"

"ওটা একজনকে গিফ্‌ট দেব বলে এনেছি। আমি আনকর্ক করব না।"

"মরার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?" পাসাং ধমকে উঠল, "ফালতু সেন্টিমেন্টে কারও কোনও উপকার নেই। গাড়িতে বসে ঠান্ডায় জমে মরে গেলে কে পাবে ওই গিফ্‌ট?"

রাধা জবাব দিল না। পাসাং গাড়ি চালাতে-চলাতে হাত বাড়িয়ে বলল, "দেখি, কী হুইস্কি?"

রাধা ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বের করে দিল। পাসাং-এর মনোযোগ তখন সামনের রাস্তায়। সে বোতলটা চেয়েও দেখল না। হাতে নিয়েই পিছনে সাঙ্গের কাছে চালান করে দিল, "ছিপিটা খোল তো।"

রাধা বাধা দেওয়ার কথা ভাবতেও পারল না। সে চোখ বড় করে চেয়ে দেখল। সাঙ্গে ছিপি খুলে বোতল ফেরত দিল পাসাং-এর হাতে। পাসাং গাড়ির গতি কমিয়ে বোতলে চুমুক দিল। বোতলটা রাধার দিকে এগিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিল, "বাঁচতে চাইলে একটুখানি খেয়ে নেওয়াই ভাল।"

রাধা আর আপত্তি করতে পারল না। তার শরীরে কাঁপুনি বেড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, বুকের ভিতরে ভূমিকম্প জেগে উঠছে। সে নাক টিপে এক ঢোক নিট হুইস্কি গিলে ফেলল। আগুনে এত শান্তি। তরল আগুন খাদ্যনালী দিয়ে নামতে-নামতে ভিতরে জমে ওঠা বরফ গলাতে থাকল। শিরা-উপশিরায় বয়ে চলা রক্ত গরম হতে থাকল। ক্রমশ স্নায়ু শান্ত হয়ে এল রাধার। সে আরও এক ঢোক গিলল। পাসাং গাড়ি চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করল, "স্কচ?"

হুইস্কির বোতলটা পাসাং-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে রাধা অ্যালকোহলের ঝাঁঝে ধরে আসা গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"না, থাক," হুইস্কি নিল না পাসাং। নিজের ছোট বোতলের বাকি আপাং সবটা এক চুমুকে শেষ করে জানাল, "রাস্তায় আমাদের আপাংই ভাল।"

ইতিমধ্যে ঝড়ের গতি বেড়ে উঠেছিল। বরফও পড়ছিল আগের তুলনায় বেশি। ফগ লাইট জ্বালিয়েও রাস্তা ভাল বোঝা যায় না। চালু রাস্তায় কিছুক্ষণ ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে একটা ছোট গুম্ফার সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল পাসাং।

"আজ এই ওয়েদারে তাওয়াং যাওয়া যাবে না।"

রাধা গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, "এখানে থাকব কোথায়? হোটেলটোটেল আছে?"

"নেই। দেখি, যদি লামাদের দয়ায় এই গুম্ফায় রাতটা কোনওভাবে কাটানো যায়।"

"আর যদি ওরা অ্যালাও না করে?"

"তা হলে মুশকিল," সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে পাসাং বলল, "আমি আর সাঙ্গে ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

পাসাং ও সাঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল গুম্ফার সদর দরজার দিকে। কিছুক্ষণ পরে সাঙ্গে ফিরে এসে বলল, "চলুন। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।"

গুম্ফার টিনের চাল, তাতে ঝপঝপ বরফ পড়ার শব্দ। পাথরের মেঝে কনকনে ঠান্ডা। ঘরের এক প্রান্তে ভগবান তথাগতের সৌম্যদর্শন মূর্তি। সামনের দিকে একটুখানি জায়গায় খড় বিছানো। সাঙ্গে দুটো স্লিপিংব্যাগ এনে তার একটা রাধার জন্য তৈরি খড়ের বিছানায় রাখল। পাসাং বলল, "কষ্ট হবে। কিন্তু, আজ এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করার উপায় নেই।"

"না না, এই ঠিক আছে," রাধা বলল বটে, তবে খড়ের বিছানায় উঠে স্লিপিংব্যাগে ঢুকে দেখল ঠান্ডা তাতেও বাগ মানে না। সে সাঙ্গেকে প্রশ্ন করল, "এই স্লিপিংব্যাগটা কার?"

সাঙ্গে জবাব না দিয়ে তাকাল পাসাং-এর দিকে। পাসাং ভাবলেশহীন মুখে বলল, "আমার।"

রাধার রীতিমতো শরীর খারাপ লাগছিল। সে স্লিপিংব্যাগের চেন অর্ধেক টেনে খড়ের বিছানায় কুঁকড়ে বসে ছিল। পাসাং-এর জবাব শুনে ধড়মড়িয়ে উঠতে গেল, "সে কী? তা হলে...?"

"আমাদের এমন এক-আধদিন অভ্যেস আছে। তা ছাড়া আমার এই লম্বা জ্যাকেটটা যথেষ্ট গরম। চিন্তার কিছু নেই।"

রাধা ব্যাগ থেকে নিজের একটা ভারী চাদর বের করে সাঙ্গের দিকে এগিয়ে দিল, "এটা রাখো।"

সাঙ্গে আবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল পাসাং-এর দিকে। পাসাং সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। সাঙ্গে বিনাবাক্যব্যয়ে চাদরটা নিল। পাসাং ইতিমধ্যে একটা মাটির পাত্রে কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালানোর তোড়জোড় করছিল। সাঙ্গে তার পাশে খড় বিছিয়ে নিজেদের

বিছানা তৈরি করে ফেলল। নিজে ঢুকে পড়ল তার স্লিপিংব্যাগের মধ্যে। আগুন জ্বালানো হতে আশপাশে ঠান্ডা একটু কমল। আরাম বোধ করল রাধা। নিজেদের খড়ের বিছানায় উঠে পাসাং রাধার চাদর গায়ে জড়িয়ে আপাং-এর নতুন বোতল খুলে বসল। সাঙ্গের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পান করে চলল তা থেকে। রাধার চোখে চোখ পড়তে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "কিছু করার নেই। ভিতর গরম করতে হবে।"

লামারা ভদ্র এবং অতিথিবৎসল। তিন অনাহূতের জন্য তিন বাটি থুকপা ও বড় এক ফ্লাস্ক ভরতি গরম জল পাঠিয়ে দিলেন। থুকপা দিয়ে রাতের খাওয়া চুকল। পাসাং-এর পরামর্শে একটু হুইস্কির সঙ্গে অনেকটা গরম জল মিশিয়ে খেয়ে আরাম পেল রাধা।

পাসাং হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "ওই বোতলে আর কতটা আছে?"

"প্রায় সবটাই তো আছে। দরকার?"

"আমার না। ভেট দেব।"

"কাকে?"

পাসাং হাসল। বলল, "ভগবানের থান। প্রসাদও পেয়েছি। সুতরাং ভেট চড়ানো কর্তব্য। এখন সে কার ভোগে লাগবে, ভগবানের না ভক্তের, তা দেখা আমাদের কাজ নয়।"

রাধার হাত থেকে বোতল নিয়ে নিজে এক চুমুক দিয়ে ছিপি বন্ধ করে বোতলটা জ্যাকেটের নীচে ঢুকিয়ে সে গুম্ফার ভিতরের কোনও ঘরে গেল। মিনিটপাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, "বাবাজিরা বেজায় খুশি।"

রাধা অবাক হয়ে বলল, "বাবাজিরা মানে...?"

পাসাং ঠোঁটে আঙুল তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ভগবানের খাস লোক বলে কি ওরা মানুষ নয়? সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ খাঁটি স্কচ পেলে খুশি হয়। ওরাও খুশি।"

প্রসঙ্গ বদলাতেই হয়তো রাধা জিজ্ঞেস করল, "এই জায়গাটার নাম তো সেলা? তাওয়াং এখান থেকে..."

"হ্যাঁ, তাওয়াং এখনও দূর আছে।" মাথা নাড়ল পাসাং। রাধার কথা পুরো না শুনেই বলে উঠল, "কিন্তু, সেলা আসলে এক তরুণীর নাম।"

নড়েচড়ে বসল রাধা। প্রশ্ন করল, "মানে? কোনও এক মেয়ের নামের সঙ্গে এই জায়গার নামের যোগ আছে?"

"আছে।"

রাধা কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইল পাসাং-এর দিকে। পাসাং হেসে বলল, "গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে?"

"তা করছে। বাইরে বরফ পড়ছে, হিমেল হাওয়া বইছে শনশনিয়ে। ভিতরে আগুনের চারপাশে আমরা ক'জন। গল্প শোনারই তো আবহাওয়া।"

"ভূতের গল্প?"

"না। সেলার গল্প শুনব।"

"এও এক ভুতুড়ে গল্প।"

"কেন?"

"এখানেও গল্পের শেষে ভূত আসে।"

"শুনব।"

"অনেক দিন আগে..."

পাসাংকে থামিয়ে দিয়ে রাধা প্রশ্ন করল, "কতদিন আগে?"

"একেবারে ঠিকঠাক দিনক্ষণ চাই?"

রাধা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। পাসাং বলল, "কিন্তু, এর সত্যি-মিথ্যের কোনও ঠিক নেই। লোকের মুখে ফেরে এই গল্প। আমিও স্থানীয় মানুষের মুখেই শুনেছি। সত্যি কি মিথ্যে সেই গবেষণা করিনি।"

"আমিও করব না। কিন্তু কতদিন আগে?"

পাসাং কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "নাইনটিন সিক্সটি-টু..."

"তবে বেশিদিন আগে নয়।"

"এখানে আমরা যে কয়েকজন মজুত আছি, তাদের সকলেরই জন্মের আগে।"

"মানুষ জন্মেছে তারও অনেক আগে।"

রাধার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পাসাং বলল, "ঠিক। এই গল্পও আসলে হয়তো তখনই জন্মেছে।"

"আমারও তাই মনে হয়। এবার গল্পটা শুনি।"

পাসাং আপাং-এ লম্বা চুমুক দিয়ে উলটো হাতে ঠোঁট মুছে বলল, "ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন সিক্সটি-টু, আসলে অনেকদিন আগে..."

খানিকটা পথশ্রমে আর খানিকটা হুইস্কির ঘোরে, কখন চোখ বুজে এসেছিল রাধার। হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঠোঁট থেকে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। জলতেষ্টা পাচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসেরও অসুবিধে হচ্ছে। ঘরের বাতাস কেমন ভারী হয়ে এসেছে। টিনের ছাদে বরফ পড়ার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার শনশনে আওয়াজও ক্ষীণ। স্লিপিংব্যাগের চেন খুলে উঠে বসল সে। মাটির পাত্রের আগুন কখন নিভে গিয়েছে। পড়ে আছে একরাশ ছাই। ঘর এখন ফ্রিজারের মতো ঠান্ডা। দূরে ভগবান তথাগতের সামনে জ্বালানো প্রদীপ এখনও কয়েকটা জ্বলছে। সেই মিটমিটে আলোয় বিছানার পাশে রাখা ফ্লাস্কটা চোখে পড়ল। খানিকটা গরম জল খেল রাধা। জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে তাকিয়ে দেখল, কোনাকুনি ফুটচারেক দূরে খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে পাসাং ও সাঙ্গে। না। আবছা আলোয় চোখ আরও সয়ে আসতে মনে হল, পাসাং নেই। স্লিপিংব্যাগে গুটিসুটি একা ঘুমোচ্ছে সাঙ্গে। নিস্তব্ধ ঘরে হঠাৎ কিছুর আওয়াজ হল। রাধা চমকে ঘুরে তাকিয়ে দেখল, দূরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক লম্বাচওড়া অন্ধকার মূর্তি। আপাদমস্তক তার কালো

কাপড়ে ঢাকা। রাধার বুক ধড়াস করে উঠল। সে সাঙ্গেকে ডাকতে গেল। তখনই শুনল পাসাং-এর চাপা কণ্ঠস্বর, "ভয় নেই। আমি।"

কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তি পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। না, কালো কাপড় নয়। মূর্তি কাছে আসতে তার গায়ে জড়ানো নিজের চাদরটা চিনতে পারল রাধা। পাসাং বলল, "বাইরেটা এখন চাঁদের আলোয় অসাধারণ।"

"আমিও দেখব," রাধা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল।

"কিন্তু, বাইরে বেশ ঠান্ডা।"

রাধা ব্যাগ থেকে আরও একটা সোয়েটার ও জ্যাকেট বের করে পরল। চাদর আরও একটা ছিল তার। সেটাও গায়ে জড়াল। শেষে মাথা ঢাকল পাসাং আর সাঙ্গের দেওয়া মনপা স্কার্ফে। পাসাং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার?"

"ঠিক আছে।"

পাসাং সদর দরজা খুলল। একরাশ ঠান্ডা হাওয়া এসে রাধার শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। তবু চোখ জুড়িয়ে গেল বাইরেটা দেখে। সত্যিই অসাধারণ। আজ কি পূর্ণিমা? না-ও যদি হয়, তবু তার আশপাশে কোনও তিথি। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে চারপাশ। জমির উপরে পুরু বরফের চাদর বিছানো। গাছের ডালে-পাতায় দুধের সরের মতো বরফ জমে আছে। অবশ্য বরফ পড়া এখন বন্ধ। হাওয়ার বেগও কম। ঠান্ডা লাগলেও আজ এই রাতের পৃথিবীতে সেও সয়ে যায়। রাধা স্কার্ফটা টেনে মাথা এবং কান আরও একটু ঢেকে নিতে চেষ্টা করল। পাসাং গুম্ফার সদর দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। রাধা অনুসরণ করল তাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখল, এখানে হেঁটে বেড়ানো সহজ কাজ নয়। নরম বরফে বুটপরা পা গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। পিছলে পড়ার আশঙ্কা ষোলোআনা। পাসাং হাত বাড়িয়ে বলল, "সাবধান!"

রাধা সাবধানে পা ফেলে পাসাং-এর হাত ধরে তার পাশে-পাশে চলল।

ঘুমের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরেই ঠান্ডা লাগছিল সাঙ্গের। স্বপ্ন দেখছিল, বরফে-ঢাকা অচেনা এক উপত্যকায় সে হেঁটে চলছে। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। এমন একটা জায়গায় কী দরকারে সে এসেছে তা স্পষ্ট নয়। চলতে-চলতে হঠাৎই এক চোরা গর্তে পড়ে গেল। অমনি চারদিক অন্ধকার। গর্ত থেকে বেরোনোর রাস্তাটা কিছুতেই চোখে পড়ে না। গর্তে খাপে-খাপে আটকে গিয়েছে সে। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই হাত-পা নড়ে না। আর, গর্তটা কী ঠান্ডা! উঃ! ভীষণ শীত! সাঙ্গে চোখ মেলে দেখল, গর্তে নয়, গুম্ফায় খড়ের বিছানায় নিজের স্লিপিংব্যাগে আঁটসাঁট শুয়ে আছে সে। ঘাড় কাত করে দেখল, গুম্ফার দরজার একটা পাল্লা খোলা। সেখান থেকে হুড়মুড়িয়ে শীত আসছে ভিতরে। ব্যাপার কী? দরজাটা তো বন্ধ করেই শোওয়া হয়েছিল। হঠাৎ খুলে গেল কেন? সাঙ্গে উঠে বসে দেখল, পাসাং নেই। ওদিকে অন্য বিছানায় সেই মেয়েটাও নেই। ঘরের মধ্যে কোথাও নেই দু'জন। বাইরে গিয়েছে? সাঙ্গে বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে এল। বাইরেটা দেখে হাসল সে। বেশ রোম্যান্টিক। সন্দেহ নেই, মেয়েটা চাঁদের আলোয় বেড়াতে চেয়েছে। পাসাং আতেবোর কপাল! এই চাঁদ আর এই বরফ সাঙ্গেরই মতো রোজ দেখছে সে। তবু এই শীতে গাইড হয়ে টুরিস্টের সঙ্গে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। কী না করতে হয় মানুষকে? নইলে, এই রাত কি বাইরে ঘুরে বেড়ানোর রাত! নাকি, গুম্ফার খড়ের বিছানায় স্লিপিংব্যাগে একা শীতে কাঁপার রাত? প্রেমিকা নোরজিনের কথা মনে পড়ল সাঙ্গের। গ্রামে পাশাপাশি বাড়ি তাদের। নোরজিন এখন কাছে থাকলে তাকে নিয়ে এই ঠান্ডায় মোটেও বাইরে বেরোত না সাঙ্গে। বরং অনেক আরাম হত তাকে

বুকে জড়িয়ে স্লিপিংব্যাগের মধ্যে ঢুকে থাকতে। শীত কোথায় ভেগে যেত। নোরজিন যেমন নরম, তেমনই গরম। প্রেমিকা কাছে নেই বলেই হয়তো, সাঙ্গে পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এল গুম্ফার বাইরে। দরজা বাইরে থেকে ভাল করে বন্ধ করে দিল। সামনে তাকিয়ে দেখল, সিঁড়ির নীচে বরফে দু'জোড়া জুতোর সারি দিয়ে গভীর ছাপ। এই ঠান্ডায় বরফ ভেঙে কোথায় গেল ওরা? আচ্ছা পাগল যা হোক! পাসাং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করতে পারল না মেয়েটাকে? জ্যাকেটের হুড তুলে মাথা ও কান ভাল করে ঢেকে জোড়া পায়ের চিহ্নকে অনুসরণ করে এগোল সাঙ্গে। যা-ই বলো, এমন চাঁদ কখনও পুরনো হয় না। যতবার দেখি পাগল-পাগল লাগে। নোরজিন কেন যে সঙ্গে নেই? দিনপনেরো আগে শেষ দেখা হয়েছিল। তখন ছিল ঘোর অমাবস্যা। সে আবার অন্যদিক দিয়ে ভালই হয়েছিল। নইলে, বাড়ির খড়ের গাদার পিছনে নোরজিন কি সেদিন আসতে রাজি হত? লোকে দেখে ফেলত না? চাঁদ না-থাকাও কখনও-কখনও ভাল। তবে মা-বাপ আর পঞ্চায়েতের খবরদারি না থাকলে চাঁদ থাকা আরও ভাল। ভাবতে-ভাবতে চলল সাঙ্গে। কিছুদূর যাওয়ার পর কানে এল মৃদু কণ্ঠস্বর। যেন হাজার মাইল দূর থেকে হাজার বছর আগের কোনও কথোপকথনের আভাস সাগর পাড়ি দিয়ে এইমাত্র কূলে এসে পৌঁছোল। সাঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাল। কেউ তো কোথাও নেই। পিছনে তাকাল। ভগবান তথাগতের মন্দির বিরাট সাদা ক্যানভাসে শিল্পীর খেয়ালে আঁকা একচিলতে ধূসর আকৃতি দেখাচ্ছে। প্রায় অলৌকিক। লামারা নমস্য মানুষ। ভগবানকে পেয়েছেন ওঁরা। নইলে, এই নির্জনে শীত, বর্ষা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা...চলতে-চলতে দিগন্তহীন সাদা বরফের বিস্তারে বড় একা মনে হল নিজেকে। অকূল সমুদ্রে ভেসে চলা একা একজন। এও অসহ্য। নোরজিন কাছে থাকলে ভাল হত। আগামীকাল তাওয়াং পৌঁছেই ক'দিন ছুটি নিয়ে গ্রামে যাবে সাঙ্গে। মনে পড়ল,

সন্ধেবেলায় পাসাং-এর মুখে শোনা সেলার গল্প। গল্পটা সাঙ্গে আগেও শুনেছে।

উনিশশো বাষট্টি সাল। চিন-ভারত সীমান্তযুদ্ধ। গিরিসংকটের ওপারে পৌঁছেছে চিনা সৈন্যদল। এপারে অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনা। দীর্ঘ লড়াইয়ে একে-একে মৃত্যু হয় তাদের প্রায় সকলেরই। পিছন থেকে মূল বাহিনীর সাহায্য এসে পৌঁছোয় না। সৈন্যদলের সকলকে হারিয়ে অবশেষে একা কুম্ভের মতো গিরিসংকটের পথ আগলে দাঁড়ান লেফটেন্যান্ট যশোবন্ত সিংহ। বাকি অস্ত্র ও গোলা ব্যবহার করে গেরিলা কৌশলে আরও কিছুকাল লড়াই চালিয়ে যান তিনি। এই যুদ্ধে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেন তাঁর প্রেমিকা স্থানীয় তরুণী সেলা। কোনও প্রশিক্ষণ না-থাকা সত্ত্বেও অপরিসীম শৌর্যে লড়তে থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের তীব্রতা দেখে চিনা সৈন্যদলের ধারণা হয়, এখনও অনেক ভারতীয় সৈন্য দু'পাশের পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে গিরিসংকটের পথ আগলে রয়েছে। চিনারা এগিয়ে আসার সাহস না-পেয়ে গিরিসংকটের প্রান্তে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেম! সাঙ্গে চারপাশে তাকাল। মনে হল, সময় এখানে সেই হানাদার চিনাবাহিনীর মতোই থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত কোনও পরিবর্তন নেই। অথচ, ভারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হাত-পা নাড়াতেও তাকে অনুভব না করে উপায় নেই। এই লড়াই মানুষ কি একা লড়তে পারে? প্রেম তো যুদ্ধক্ষেত্রেই তীব্র। যুদ্ধেরই মতো। শেষে একদিন শত্রুর গুলি এসে লাগে যশোবন্তের বুকে। তাঁকে লুটিয়ে পড়তে দেখেন সেলা। সোল্লাসে ছুটে আসে চিনা সৈন্যদল। শেষবারের মতো সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে পাহাড়চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়েন সেলা। আত্মহত্যা করেন।

ঘাড়ের উপর ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলল কেউ। সাঙ্গে থমকে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই। বাতাসের গতি বাড়ছে। তারই প্রথম দমকা

এসে ছুঁয়েছে তাকে। হঠাৎ সাঙ্গের গায়ে কাঁটা দিল। সে থমকে দাঁড়াল। এখনও নাকি যশোবন্ত ও সেলা, নাকি তাঁদের আত্মা, নাকি তাঁরাই, থমকে থাকা সময়ের গহ্বরে ঘুরে ফেরেন এই গিরিসংকটে। আজও তাই কাছের আর্মি ব্যারাকের সেনারা তাঁদের জন্য খাবার রান্না করে। প্যারাডাইস লেকের উপকূলে পেতে দেয় বিছানা। বরফে ঢাকা ধু ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে দিগন্তে চেয়ে রইল সাঙ্গে। ওখানে কোথাও বরফের চাদরে ঢাকা আছে প্যারাডাইস লেক। এই নির্জনে সেনাবাহিনীর তৈরি করা খাবার নিয়মিত খেয়ে যায় কেউ। সকালে বিছানা দেখা যায় ব্যবহৃত। ওঁরা কি এখন ওখানে আছেন? শিউরে উঠে সাঙ্গে ভাবল, হতেই পারে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া শব্দহীন এই পৃথিবীতে নইলে কেন এমন গা ছমছমে ভাব? অনেকেই বলে, ওঁদের দেখেছে। আর এগোতে সাহস হল না। গুম্ফায় ফিরে যাবে বলে ঘুরতে গিয়েও স্তব্ধ হয়ে গেল সাঙ্গে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আগে দেখেনি সে। যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়েছে দূরে ওই ওক গাছের নীচে। দুই ছায়ামূর্তি। পরিচিত মনপা টুপি-মাথায় পুরুষের বুকে নিবিড় হয়ে থাকা এক নারী। এক আশ্চর্য মিথুন মূর্তি।

নিঃশব্দ পায়ে গুম্ফায় ফিরে এল সাঙ্গে। বাড়ি ফিরে নোরজিনকে বলার মতো একটা গল্প পেয়েছে সে আজ। সাঙ্গের অভিজ্ঞতার কথা শুনে কী বলবে নোরজিন? বোধহয় কিছুই বলবে না। শুধু বুকের কাছে ঘন হয়ে আসবে। সাঙ্গেও নীরবে জড়িয়ে ধরবে তাকে। ঠিক ওদের মতো। জ্যাকেট খুলে স্লিপিংব্যাগের মধ্যে ঢুকে ওইটুকু জায়গাও অনেক বড় মনে হল আজ। ভীষণ ফাঁকা। চট করে ঘুম আসতে চাইল না।

মিনিটদশেক পরে পাসাং আর রাধা ফিরে এল। রাধা জ্যাকেট আর সোয়েটার খুলে নিজের বিছানায় স্লিপিংব্যাগে ঢুকল। পাসাং সাঙ্গের পাশে জ্যাকেট গায়েই চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ

পরে, রাধা ঘুমিয়ে পড়েছে আন্দাজ করে সাঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলল, "আতেবো, আমি দেখেছি।"

"কী?"

জবাব না পেয়ে পাসাং জিজ্ঞেস করল, "কী দেখেছিস সাঙ্গে? ভূত?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সাঙ্গে বলল, "বেশ মানিয়েছিল কিন্তু!"

পাসাং হাসল। সাঙ্গের মাথায় আলতো বিলি কেটে বলল, "কী দেখতে কী দেখেছিস! সবকিছু এত সাদাকালো নয় রে সাঙ্গে যে, একনজরেই মাপবি। এখানকার সেই প্রবাদ আছে না..."

প্রবাদটা পাসাং আওড়াতে যেতে সাঙ্গে বলে উঠল, "দেবে কসেঙ্গে কৌ আলেদেন/ইয়াপা মাঙ্গাদা এংগে মাঙ্গুপু আলেদেন," যেটা সে তখন রাধাকেও বলেছিল। কিন্তু রাধা বুঝতে পারেনি আর পাসাংও বোঝায়নি।

"ঠিক," মাথা নাড়ল পাসাং, "দূর থেকে সবই সহজ মনে হয়, স্বর্গীয় বা ঘৃণ্য / কাছে এলে সেও বোঝা দায়, জটিলতাও অনন্য।"

সাঙ্গে আর কিছু বলল না। জিজ্ঞেস করল না কেন! পাসাং গুম্ফার ছাতের দিকে চেয়ে প্রবাদটা ফের মনে-মনে আওড়াল। দূর থেকে সবই সহজ মনে হয়। সেই মনে হওয়াটা নাকি প্রায়ই ভুল। কাছে গেলেই বোঝা যায়, সে কত জটিল। কিন্তু তার জটিলতা বোঝা যায় কি? যদি না যায় তো, কাছে গিয়ে লাভ কী? ঘুমন্ত রাধার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাসাং। তবু যেতে হয়।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ গাড়ি সেলা ছেড়ে তাওয়াং রওনা হল। তাওয়াং-এ ভাল হোটেলে এনে তুলল পাসাং। শহরে তার ভাড়াবাড়িও দেখিয়ে আনল একদিন। একটা ছোট ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর। পাসাং একাই থাকে এখানে। রীতিমতো আপ্যায়ন করল। তার বাড়িতে চা খেতে-খেতে রাধা জিজ্ঞেস করল, "আমাকে তোমার বউ, তোমার ঘরসংসার দেখাবে না?"

পাসাং হাসল। বলল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু তা হলে ওর গ্রামে যেতে হবে।"

"যাওয়া যায় না?"

"নিশ্চয়ই যায়। কালই চলো।"

ছাংবুতে দস্তুরমতো অভ্যর্থনা হল বিদেশি অতিথির। ইয়াংকি আজকাল তার ট্রেকার্স হাটের ব্যবসায় নতুন সংযোজন করেছে বিভিন্ন প্যাকেজ। অতিথিদের জন্য উপজাতি নাচ-গানের ব্যবস্থা তেমনই একটা। স্থানীয় একজন গাইয়ে-বাজিয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট টাকা ভাগাভাগির ভিত্তিতে চুক্তি করা আছে তার। বিদেশি, সে ট্রেক করে আসা পথিক বা গাড়িতে বেড়াতে আসা পর্যটক, কেউ এই অঞ্চলের সংস্কৃতির একঝলক স্বাদ পেতে ইচ্ছুক হলে, ইয়াংকি তার ব্যবস্থা করে। কেউ-কেউ এমনও আসে, যারা কয়েকটা দিন কোনও উপজাতি পরিবারের সঙ্গে থেকে তাদের জীবনযাপনের ধারা জানতে চায়। ইয়াংকি তারও ব্যবস্থা করে দেয়। গ্রামের কয়েক ঘর মানুষের সঙ্গে তার এই বিষয়েও চুক্তি করা আছে। সন্দেহ নেই, ইয়াংকি দ্রেমা এখন একজন সম্পন্ন গ্রাম্য গৃহস্থ। ব্যাবসার পাশাপাশি ঘরের সমস্ত বিষয়েও তার নজর থাকে। গোছানো ঘরগেরস্থালি।

সব দেখেশুনে রাধা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, "দিব্যি সংসার তোমার! হিংসে হচ্ছে।"

পাসাং জবাব দিল, "আমার নয়। এ হল ইয়াংকির ঘরসংসার।"

রাধার কপালে ভাঁজ পড়ল। সে বিষণ্ণ স্বরে বলল, "তোমরা এমন কেন? এত অহংকার? মেয়েরা স্বামীর ঘরকে নিজের ঘর মনে করতে পারলে, ছেলেদের স্ত্রীর ঘরকে নিজের ঘর মনে করতে অসুবিধে কোথায়?"

পাসাং বলল, "ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।"

"ব্যাপার তা হলে কী?" অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল রাধা।

পাসাং কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে বলল, "কিছু না।"

বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছিল যথাসময়ে। উৎসব উপলক্ষে তেজপুর আর বমডিলা থেকে আগাম একরাশ বাজার করে এনেছিল পাসাং। জামাকাপড়, খাবারদাবার, পানীয়। দেশি মদ আপাং-এর পাশাপাশি বয়ে চলল নানা ধরনের বিলিতি মদের স্রোত। বিয়ের দিনতিনেক আগে এক বিকেলে ছাংবু গ্রামের গাঁওবুড়ো ইয়াংকির বাড়ি এল দলবল নিয়ে। শূকরের মাংস-ভাজাসহ আপাং-এর গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে বলল, "গ্রামের পঞ্চায়েত এই বিয়ে মানতে রাজি নয়। জাতের বাইরে কেন বিয়ে করবে ইয়াংকি? লোকটা যতই তার নিজের ধর্ম বদলাক, তাতে সে কিন্তু আমাদের নিজের লোক হয়ে যায়নি। গোষ্ঠীর মধ্যে যোগ্য পাত্রের কি অভাব? নিজেদের মধ্যে পছন্দমতো বিয়ে করুক ইয়াংকি। সে প্রয়োজনে একটার জায়গায় দুটোও হতে পারে। এই তো শুকপু আর ফুনসু ছিল দু'ভাই। দু'জনের দুটো বউ। ফুনসু মরে গেল টাইফয়েডে। তো ওর বউটা যাবে কোথায়? শুকপুই ওকে বিয়ে করল। তা হলে শুকপুর দাঁড়াল দুটো বউ। ওদিকে ওয়াংচু আর কেসাং, এদেরও ছিল দু'ভাইয়ের একটা করে বউ। ওয়াংচুর বউটা মরে গেল বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে। তারপর ওয়াংচু আর পাত্রী পায় না। তখন কেসাং-এর বউ রিনচিন ওয়াংচুকে বিয়ে করে তাকেও নিজের সংসারে জায়গা দিল। রিনচিন দুই স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করছে সেই থেকে। সমস্যা তো আমাদের সমাজে কোথাও কিছুই নেই। খামোখা একটা বাইরের লোককে চিরকালের জন্যে ঘরে এনে তোলা কেন? দরকারটা কী? অতিথি হয়ে এসেছে। আর পাঁচজন অতিথির মতোই একদিন চলেও যাবে। ঠিক কিনা?"

"সে তো বটেই, সে তো বটেই!" সমবেত সকলেই, এমনকী, ইয়াংকির বাবাও মাথা নেড়ে গাঁওবুড়োর যুক্তি স্বীকার না করে পারল না।

গাঁওবুড়ো খুশি হয়ে প্রস্তাব দিল, "লোবসাং আর লুংতান দুই

ভাইয়ের যোগ্য পাত্রী দীর্ঘদিন পাওয়া যাচ্ছে না। এই দুঃখজনক ঘটনার কথা গ্রামের কারওই অজানা নয়। তো চাইলে ইয়াংকি এদের দু'জনকে বিয়ে করে নিক। একটার জায়গায় দুটো বর পাবে। দু'জনেই পরিশ্রমী। ষাঁড়ের মতো খাটতে পারে, সে জমি-চাষই বলো আর কাঠ-কাটাই বলো। ইয়াংকির হুকুমে দু'জনে রাতদিন উঠবে আর বসবে। এই সুখ এক বিদেশিকে বিয়ে করে কি জীবনেও পাবে সে?"

"না, কখনওই না। সম্ভবই নয়," মাথা দুলিয়ে এ-বিষয়েও সকলেই একমত হল, এক ইয়াংকি ছাড়া। বোঝা গেল, লোবসাং বা লুংতান, এদের কাউকেই বিয়ে করতে সে রাজি নয়, "বরং, একা থাকব," স্পষ্ট জানিয়ে দিল।

"তবে তাই থাক। কিন্তু..." বক্তব্য শেষ না করে গাঁওবুড়ো গম্ভীর মুখে তর্জনী নাড়ল।

"এলাকার বাইরে তো গাঁওবুড়োর ফতোয়া চলে না," ইয়াংকিকে নিরালায় বোঝাল পাসাং, "চলো, আমরা দু'জনে আর কোথাও চলে যাই।"

"তাই কি হয়? যাব বললেই যাওয়া যায়?" বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল ইয়াংকি।

"অসুবিধে কী আছে? পরিশ্রম তুমিও করতে পারো, আমিও পারি। আর, গাড়ির কাজ যতটুকু জানি তাতে এই পৃথিবীর কোথাও আমার রোজগারের সমস্যা হবে না। না খেয়ে আমরা মরব না ইয়াংকি।"

ইয়াংকি গভীর দৃষ্টি মেলে তাকাল পাসাং-এর দিকে, "তুমি অনেক কিছুই জানো, হয়তো অনেকভাবেই রোজগার করতে পারো। কিন্তু আমি যে শুধু এই গ্রাম্য ঘরকন্নার কাজই জানি। আর, আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে একটু-একটু করে এই সংসার দাঁড় করিয়েছি। ট্রেকার্স হাটের ব্যাবসার পাশাপাশি আছে জমির ফসল। একটা-

একটা করে গোয়ালে গাই-বাছুর, শূকর, ভেড়া, মুরগি বাড়িয়েছি। এ সবই তো আমার নিজের। ছেড়ে যাব কেন? আমার সন্তান যেমন, তেমনই আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, সকলেই আমার উপর ভরসা করেন, সবাই আমার পোষ্য। এঁদের ফেলে যাব কীভাবে? পারব না পাসাং।"

পাসাং কথা বাড়ায়নি। বুঝেছিল, ইয়াংকির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন যুক্তির অবতারণা করেনি। নইলে বলার হয়তো ছিল তখনও অনেক কিছু। ইয়াংকির সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল এর পর। কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ট্রেকারদের গাইড সেজে পাসাং-এর আসা-যাওয়ার পথে দু'জনের দেখা হয়। কথা হয়। ওদের যে একদিন বিয়ে হতে পারত, সেকথা কেউ আর তোলে না অবশ্য। তবে কথাটা সকলে ভুলেও যায়নি। ওই গ্রামের ছেলে সাঙ্গে নাওয়াং তার গাড়িতে খালাসির কাজ করছে আজ বছরচারেক। হয়তো সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকে বলেই, সে আজও তাকে ডাকে, "আতেবো।"

সন্ধেবেলায় পাসাং রাধাকে নিয়ে তাওয়াং ফিরে গেল। সাঙ্গে রয়ে গেল গ্রামে। তার কিছু জরুরি কাজ আছে। সেসব সেরে দিনতিনেক পরে সে তাওয়াং আসবে। এই ক'দিন পাসাং-এর তাকে প্রয়োজন হবে না। দূরে কোথাও এখন যাওয়ার নেই। রাধা তার ছুটির বাকি দিনগুলো তাওয়াং-এই থাকবে। পাসাং-এরও গ্যারাজ আপাতত তালাবন্ধ। তোর্গ্যা উৎসবের ছুটিও পড়েছে। তাওয়াং মনাস্ট্রিতে লামাদের নাচ সেই উপলক্ষে। রাধার বেশ জমকালো মনে হল, বেশ নাচ। পাসাং প্রস্তাব দিল, "মেলা দেখার ইচ্ছে আছে? কাছেই সুর্বিতে?"

সুর্বি ছোট গ্রাম। মেলাও খুদে। কাঠের নাগরদোলা, গুটিকয় দোকান, ওরই মধ্যে একটি শুঁড়িখানা ইত্যাদি। এক বুড়ো কোত্থেকে

ভাঙা হারমোনিয়ম নিয়ে হাজির হয়েছে মেলায়। ওই বাজিয়ে অক্লান্ত গেয়ে চলেছে একটার পর-একটা পুরনো হিন্দি গান। বেশ ভিড় ওর চারপাশে। দর্শকরা সকলেই উৎসবের মেজাজে। অনেকেরই হাতে আপাং-এর গ্লাস। পাসাংও বলল, "একটু খাই!"

রাধাকে একগ্লাস এগিয়ে দিতে সে প্রবল মাথা নেড়ে বলল, "উরেবাবা, ওতে ভীষণ বিশ্রী গন্ধ।"

পাসাং আদর করে বলল, "এমন বলে না, সোনা! এদের দুঃখ হবে।"

তখন পাসাং-এর নেশা জমে আসছে। আপাং না খেয়েও রাধাও প্রায় নেশাগ্রস্ত। বুড়ো গাইয়ে গায় ভাল। কতদিন এসব গান শোনেনি রাধা, 'তসবির তেরি দিল মে.. একটা বাংলা গানও ছিল না এই সুরে? পাসাং উঠে গিয়ে বুড়োর গলা জড়িয়ে গা দোলাতে শুরু করল। রাধা হাততালি দিয়ে উঠল। মাথায় মনপা টুপি, পড়ন্ত বিকেলে পাসাং দেব আনন্দের স্টাইলে নাচছে, লোকে হাততালি দিচ্ছে। রাধার কী হল? বরং নাক টিপে একগ্লাস আপাং গিলে ফেলল। সেদিন তাওয়াং ফিরল না ওরা। গ্রামের এক বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল পাসাং। সন্ধেবেলায় রাধাকে জড়িয়ে মেলা থেকে সেখানে ফিরতে-ফিরতে পাহাড়ের ঢালে সে গান জুড়ল, 'মুঝকো ইয়ারোঁ মাফ করনা...'

টলমলে পায়ে চলতে-চলতে রাধাও নেশায় গুনগুনিয়ে উঠল, 'মুঝকো ইয়ারোঁ।'

ক'টা দিন দেখতে-দেখতে কেটে গেল। এসে গেল ফেরার পালা। সকাল দশটায় তাওয়াং থেকে রওনা হয়ে সন্ধে ছ'টায় বমডিলা পৌঁছোল পাসাং-এর গাড়ি। রাতটা বমডিলায় কাটিয়ে পরদিন সকাল সাতটায় ফের যাত্রা শুরু হল। পথে সকলেই নীরব। পিছনের সিটে গোমড়ামুখে বসে সাঙ্গেও এক অস্পষ্ট বিষাদ অনুভব করছিল।

তার বিষণ্ণতার কারণ আছে। পুরোপুরি ব্যক্তিগত। তাতে ডুবে যেতে-যেতেও ভেসে উঠতে চাইছিল সে। বারবার তার মনে হতে থাকল, কেউ কিছু বলছে না কেন? শেষ মুহূর্তে কিছুই কি বলার নেই কারও? কিছুই কি করার থাকে না?

ভালুকপং পেরিয়ে এক জায়গায় চা-জল খেতে গাড়ি থামাল পাসাং। রাস্তার পাশেই বয়ে চলেছে জিয়াভরালি নদী। রাধা গাড়ি থেকে নেমে বলল, "আমার নদীতে নামতে ইচ্ছে করছে। একটু শুধু পা ভেজাব।"

পাসাং অবাক হয়ে বলল, "এখন?"

"তবে আর কখন?" রাধা নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কখনও এদিকে আসব কিনা জানি না!"

পাসাং কী ভেবে রাজি হল, "ঠিক আছে, চলো।"

নদীতে যাওয়ার রাস্তাটা ভাল নয়। সংকীর্ণ ভাঙাচোরা খাড়াই পথ। পাসাং-এর হাত ধরে নদীতে নেমে গোড়ালি-ডোবা জলে দাঁড়িয়ে রাধা শিউরে উঠল, "কী ঠান্ডা!"

"একে শীতকাল, তায় বরফগলা জল। ঠান্ডা তো হবেই।"

"জানি। গাইডের মতো সব বুঝিয়ে না বললেও চলবে।"

পাসাং হেসে বলল, "সরি।"

রাধা তাকে একঝলক দেখে বলল, "ঠান্ডা বলেই ভাল লাগছে," নদীর পাশে শুকনো পাথরের উপরে বসল সে। দীর্ঘ নীরবতার পর বলে উঠল, "ভারী সুন্দর নদী!"

পাসাং কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল, যদি গাইডের ভাষণের মতো শোনায়। রাধা জিজ্ঞেস করল, "এর নাম জিয়াভরালি কেন?"

"জীবন্ত নদী। লোকে বিশ্বাস করে মানুষের মতো এরও মন আছে। আর..."

"আর?"

"জিয়াভরালি জীবনদায়ী নদী। দু'পারের জনপদের জন্যে বয়ে আনে মাছ, সেচের জল। বহু টুরিস্ট এখানে র‍্যাফটিং করতে আসে। তাতেও উপার্জন হয়।"

"সাঙ্গের কী হয়েছে?"

হঠাৎ সাঙ্গের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় অবাক হল পাসাং। বলল, "সাঙ্গে! কেন, ও কিছু বলেছে তোমাকে?"

"না। কিন্তু গতকাল থেকেই দেখছি, বেচারি মুখ কালো করে বসে আছে। কী হয়েছে ওর?"

"গ্রামে নোরজিনের বাবার সঙ্গে পরশু রাতে ঝগড়া করে এসেছে।"

রাধা ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কেন?"

"নোরজিন টুকটুকে মেয়ে, খুব পরিশ্রমীও। গ্রামে ওর অনেক, যাকে বলে পাণিপ্রার্থী। ওর বাপ এখন সুযোগ বুঝে দাঁও মারতে চাইছে। সাঙ্গের কাছে দ্বিগুণ কন্যাপণ দাবি করছে। বলছে, নইলে মেয়ের বিয়ে অন্য কোথাও দেবে।"

"কী অন্যায়!"

পাসাং হাসল। বলল, "আসলে, নোরজিনের বাপ ভেবে নিয়েছে সাঙ্গে বোধহয় শহরে চাকরি করে অনেক পয়সা জমিয়েছে।"

"কী হবে তা হলে?"

"কী আর হবে? সাঙ্গের মুরোদে না কুলোলে নোরজিন অন্য কারও বউ হবে।"

"নোরজিনের কোনও বক্তব্য নেই? ও প্রতিবাদ করতে পারে না?"

"বক্তব্য হয়তো আছে। কিন্তু প্রতিবাদ করে ও যাবে কোথায়?"

"কেন, সাঙ্গের কাছে?"

"সাঙ্গের তো ওই গ্রামেই বাড়ি। বাড়ির বড় ছেলে। ঘর-পরিবার ছেড়ে ও যাবে কোথায়?"

"সবাই একরকম হয় না তা হলে? বাড়ির বড়ছেলে তো আরও' কেউ-কেউ আছে?"

রাধার মন্তব্য শুনে পাসাং কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল তার দিকে। ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে বলল, "না, সবাই একরকম হয় না।"

"তবে, মিলও কিছু আছে!" রাধা চোখের কোণ দিয়ে পাসাংকে দেখতে-দেখতে বলল, "ড্রাইভারসাহেবের যোগ্য খালাসি, দু'জনেরই বউ জোটে না।"

পাসাং রাগ করল না। ভাবলেশহীন মুখে বলল, "একেবারেই কি তাই? আমার অন্তত খাতায়-কলমে দশটা বছর..."

"থাক," পাসাংকে থামিয়ে দিয়ে রাধা তার হাতব্যাগ খুলতে-খুলতে প্রশ্ন করল, "নোরজিনের বাবা কন্যাপণ কত চাইছে?"

পাসাং রাধার হাতব্যাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "ছেড়ে দাও। ওই টাকাটা আমি সাঙ্গেকে দিয়ে দেব।"

"আমি দিলে কোনও ক্ষতি আছে? আমার সাহায্য নিতে কি সাঙ্গের পৌরুষে লাগবে?"

পাসাং কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "না, তা লাগবে না বোধহয়।"

"আর সাঙ্গেকে বোলো, ওকে নয়, আমি সামান্য সাহায্য করতে চাইছি নোরজিনকে।"

"বেশ, তা-ই বলব।"

রাধার হাতব্যাগ থেকে তার পার্সের সঙ্গেই উঁকি দিল গুটিকয় ছাপানো কাগজ। তার প্রতিটিতেই যথানির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর আছে 'অশ্রুজিৎ সান্যাল', নীচে কয়েকদিন আগের তারিখ। রাধা কাগজগুলো ব্যাগের মধ্যে একপাশে সরিয়ে পার্স বের করে তা থেকে কিছু টাকা গুনে দিল পাসাং-এর হাতে, "এতে হবে?"

"বেশি হয়ে যাবে," পাসাং হাসল। "আসলে, নোরজিনের বাপ মারাত্মক কিছু দাবি করেনি। কিন্তু বেচারি সাঙ্গের কাছে ওটাই অনেক টাকা।"

"আমি কি খুব বেশি দাবি করেছিলাম?"

পাসাং ভাবুক মুখে তাকাল। এই প্রশ্নের জবাব সে জানে না। প্রশ্নটা তাকে নয়, করা হয়েছে অশ্রুজিৎ সান্যালকে। কিন্তু সে-ও কি এর উত্তর জানে?

রাধা উঠে দাঁড়াল, "চলো," নদীর পার ধরে পাসাং-এর পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "আমি হয়তো নিজেরই অজান্তে দাবি করেছিলাম আরও একটু ধৈর্য।"

"দাবি কি অন্য তরফে কিছু ছিল না?"

রাধা থমকে দাঁড়াল, "দাবিই যদি ছিল, তবে সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল কেন?"

"তার জবাব কি তুমি বিশ্বাস করবে?"

"করব। জীয়ন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছি আমি, যে নদীর মন আছে। সে যা বলবে, সমস্ত বিশ্বাস করব।"

পাসাং কয়েক মুহূর্ত রাধার চোখে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে শেষে জবাব দিল, "রাধাকে বুঝবে বলেই সে নিজের অতীত ভুলতে চেয়ে পথে নেমে এসেছিল। জীবন শুরু করতে চেয়েছিল শূন্য থেকে।"

রাধা চোখ ফিরিয়ে নিল। নদীর পার বেয়ে উঠতে শুরু করল। রাস্তায় পৌঁছে আনমনে বলল, "সব শুরুরই পিছনে আরও দূরে অন্য কোথাও কোনও শুরু থাকে। চাইলেও সবটা পথ পিছিয়ে যাওয়া যায় না," পাসাং-এর দিকে ঘুরে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "রাধাকে কি সে বুঝেছে?"

মাথা নাড়ল পাসাং, "না।"

"নিজেকে?"

"তাও না।"

"তা হলে এই দশ বছর জীবন বাজি রেখে কী পেল সে?"

জোরে শ্বাস নিল পাসাং। শ্বাস ছেড়ে একগাল হাসল। রাধার চোখে চোখ রেখে বলল, "জীবনকে।"

রাধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "পাগল!"

অট্টহাস্য করে উঠল পাসাং। রাধা দ্রুতপায়ে গাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে বলে উঠল, "বদ্ধ পাগল!"

গাড়ি তেজপুর পৌঁছোল দুপুর দেড়টায়। রাধাকে সরাসরি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল পাসাং। বেলা তিনটেয় তার ফ্লাইট। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাসাং তখনই বমডিলার উদ্দেশে ফিরতি পথে রওনা হল। নইলে বমডিলা পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে।

রাধা বসে ছিল জানলার ধারে। আনমনে চেয়ে ছিল বাইরে। প্লেন টেক-অফ করার পর তার মনে পড়ল, ঋক এখন কলকাতায়। সে তাকে রিসিভ করতে আসবে দমদম এয়ারপোর্টে। একসময় জানতে চাইবে, 'যে কাজে গিয়েছিলে, তা কি শেষপর্যন্ত হল?'

রাধা তার হ্যাতব্যাগ থেকে একগোছা কাগজ বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল। অশ্রুজিতের স্বাক্ষর ঠিকই আছে। কিন্তু আমি যে এখনও সই করিনি? করলেই হল। যখন খুশি করা যায়। মিনিটখানেকের ব্যাপার। দশটা বছরের তুলনায় কিছুই তো নয়। তবু মনে হচ্ছে, এই কাজটুকু সারতে যুগান্ত পেরিয়ে যাবে। তোমায় আমি অপেক্ষা করতে বলব না, ঋক। দিনকয়েকের সফরের শেষ অংশে পৌঁছে ক্লান্তিতে ভরে এল রাধার শরীর। ঘুম পেল। সে আসনে এলিয়ে পড়ে চোখ বুজল।

ভালুকপং চেকপোস্টের কিছু আগে জিয়াভরালির পারে গাড়ি থামাল পাসাং। রাধার টাকাগুলো সাঙ্গেকে দিয়ে বলল, "তোকে নয়, এটা নোরজিনকে দিচ্ছে বলে গিয়েছে ও।"

সাঙ্গে টাকাগুলো মুঠো করে ধরে কিছুক্ষণ পাসাং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বলল, "নোরজিন নিশ্চয়ই থ্যাঙ্কস বলতে চাইবে। ওঁকে জানিয়ে দিয়ো।"

পাসাং হাসল। বলল, "ও জানে," ইগনিশন থেকে গাড়ির চাবি খুলে নিয়ে সাঙ্গের হাতে দিয়ে বলল, "রাখ, তোর বিয়েতে আমার তরফে যৌতুক।"

সাঙ্গের চোখে জল দেখে নিজের মনও বাষ্পময় হয়ে উঠল দেখে জোর করে হাসল পাসাং, "বোকা ছেলে! দুটোই নতুন দায়িত্ব তোর। যত্ন করিস। বউকেও, একেও।"

"চলে যাচ্ছ আতেবো? আর আসবে না কখনও?"

গাড়ি থেকে নেমে সাঙ্গের পিঠে হাত রেখে পাসাং বলল, "যা, গাড়ি স্টার্ট কর।"

এতদিন পাসাং-এর যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলেছে সাঙ্গে। আজও তার অন্যথা হলে চলে না। গাড়িতে চাবি লাগিয়ে ইঞ্জিন চালু করল সে। ভালুকপং-এর পথে রওনা হল গাড়ি। পাসাংও জিয়াভরালির পাশে-পাশে নিজের পথে ভাসল। দশ বছর আগে অশ্রুজিৎ সান্যাল নামে বছর ছাব্বিশের এক ফেরারি যুবক গায়ে চড়িয়েছিল মেকানিক হরিলাল চৌধুরীর তেল-কালি মাখা জামা। তার বছরপাঁচেক পরে হরিলাল মাথায় মনপা টুপি পরে বনেছিল পাসাং শেরিং। দশ বছরের উজানযাত্রা। পথ চলতে-চলতে আজ পাসাং-এর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল ছত্রিশ বছরের অশ্রুজিৎ সান্যাল। ফেরারির এখন ফেরার পালা স্রোতের সঙ্গে। চেতস্বান নদীরই মতো চেতনার স্রোত। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার উত্তরাধিকার। নির্বিকার প্রবহমান জিয়াভরালি।

অফিস থেকে বেরোনোর আগে বড়ছেলের চেম্বারের দিকে একঝলক তাকালেন গগন সান্যাল। অশ্রু এখনও সেই একইরকম। তা ছাড়া দশ বছরে এগিয়ে যাওয়া কর্পোরেট গাড়ি ধরতে ওকে কিছুদিন বাড়তি গতিতে দৌড়োতেই হবে। কাজ সেরে বেরোতে আজও দেরি করবে হয়তো। তার ঘরের বাইরে টুলে বসে বেয়ারা

হরিলাল চৌধুরী চাতকপাখির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঘড়ির দিকে। মেজসাহেবের কাজ শেষ হলে সে-ও ছুটি পাবে। অফিসে তালা লাগিয়ে রওনা হবে বাড়ির পথে। বেচারি হরিলাল! গগন লম্বা পা ফেলে এগোলেন। ক্লাবে পার্টি আছে। তিনি সেখানে দেরিতে পৌঁছোতে চান না।

অভিজিৎ অফিস কেটেছে ঘণ্টাদুই আগেই। দাদা ফিরে আসায় সুবিধে হয়েছে তার। কাজের চাপ অনেকটা কমে গিয়েছে। কমা দরকার ছিল। মোটে বছর দুই আগে বিয়ে করেছে সে। স্ত্রীর প্রতি প্রেম সদ্য ওভেন থেকে নামানো সিজলারের মতোই উষ্ণ ও উচ্চকিত। বউকে কথা দেওয়া আছে, আজ ভরপুর শপিং।

সন্ধে পেরিয়ে অফিস থেকে বেরোল অশ্রুজিৎ। বৃদ্ধ বেয়ারা হরিলাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে পত্রপাঠ অফিসের দরজায় তালা ঝুলিয়ে একতলায় নামার সিঁড়ির দিকে দৌড়োল। অশ্রুজিৎ পার্কিং লটে পৌঁছে গাড়িতে উঠেও নেমে পড়ল। ব্যাগ গাড়িতে রেখে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, "তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও।"

গাড়ি বেরিয়ে যেতে সে বার্কলে হাউসের নাছদুয়ার দিয়ে বাইরে এল। অফিসপাড়া। দিনের ব্যস্ততা কমছে। ডালহাউসি স্কোয়ারের পথে রাত নামছে। মোড়ে-মোড়ে হলুদ হ্যালোজেন আর রাস্তায় সার দিয়ে গাঁথা ঝিকিমিকি ট্রাফিক আলোয় দেখাচ্ছে দিনের শেষে ফাঁকা মেলার মাঠ, সুর্বির মেলা। ক্লাইভ স্ট্রিট। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট। ডান দিকের পথ ধরে গিয়ে গঙ্গা। নদীর পাশে হাঁটতে-হাঁটতে গলা থেকে টাই খুলে নিয়ে পকেটে রাখল সে। মিলেনিয়াম পার্ক। বেশ হাওয়া। বাবুঘাটে বন্ধ তর্পণ ও তিলকের দোকান। নির্জন রাস্তায় এখন মাতাল ও দালাল, "বাবু যাবেন?"

"কোথায়?"

"ছবি দেখুন না সার। সব পাবেন। সবই ঝক্কাস আইটেম।"

"কামেং যাবে?"

দালাল চোখ ছোট করে চেয়ে রইল। লোকটা টান্টু না বদমাশ? বাঁয়ে ঘুরল। ইডেন গার্ডেন্স, গোষ্ঠ পাল, আকাশবাণী, কার্জন পার্ক, গোলচক্কর। গোলের যেদিকে তাকাও রাস্তা। থমকে দাঁড়াল অশ্রুজিৎ। যে-কোনও একটা রাস্তাই সে নিতে পারে। সব রাস্তাই ঘুরেফিরে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতায়।

"ট্যাক্সি!"

"কোথায় যাবেন?"

"ছাংবু।"

"যাব না।"

"ভবানীপুর?"

"বসুন।"

মিটার ডাউন করে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, "ভবানীপুরে কোথায় যাবেন? কোন রাস্তা নেব? হরিশ মুখার্জি, না কি...?"

"জিয়াভরালি চেনেন?"

"মুদিয়ালির কাছে কি? কিন্তু সে তো টালিগঞ্জ।"

"না, টালিগঞ্জ নয়। জিয়াভরালি।"

"চিনি না। রাস্তাটা একটু বলে দেবেন?"

"এই তো, সোজা রাস্তা।"

দু'পাশে ময়দান রেখে জিয়াভরালির পথে ছুটল কলকাতার ট্যাক্সি...

———